ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ
আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী (রাহ)-এর নির্দেশিত

সহীহ মাসনূন ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ
আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ.)-এর নির্দেশিত

সহীহ মাসনূন ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ
আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ.)-এর নির্দেশিত

সহীহ মাসনূন ওযীফা

দোয়া ও এজাযত

দরবারে ফুরফুরার মেজ পীর সাহেব মুফতীয়ে আযম আল্লামা

আবু ইবরাহীম মো. উবাইদুল্লাহ সিদ্দীকী

সংকলনে

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রাপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম প্রকাশ : মুহার্‌রাম ১৪২৮ হিজরী
জানুয়ারী ২০০৭ ঈসায়ী
মাঘ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

হাদিয়া ৩৪ (চৌত্রিশ) টাকা মাত্র।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম।

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য 'তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ফরয ইবাদত পালনের পরে সদাসর্বদা নফল ইবাদত পালনে রত থেকে, বিশেষত সদা সর্বদা জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর যিক্‌রে রত রেখে তাঁরা তাযকিয়া ও বেলায়াতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছেন। সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে তাঁদের পালিত এ সকল নফল ইবাদত ও যিক্‌রের মধ্য থেকে কিছু বেছে নিয়ে মাসনূন (সুন্নাত-সম্মত) 'ওযীফা' তৈরি করতে আমাকে নির্দেশ দান করেন আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম মুহিউস সুন্নাহ আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহিমাহুল্লাহু)।

বিভিন্ন তরীকার ওযীফা ছাড়াও অনেক প্রকারের ওযীফার বই বাজারে প্রচলিত। তবে সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মাসনূন বা সুন্নাতি ওযীফার বই তেমন পাওয়া যায় না। শুধু ফুরফুরার মুরিদদের জন্যই নয়, আগ্রহী সকল মুসলিম যেন অল্প পরিশ্রম ও সময়ে সহীহ সুন্নাতি ওযীফাগুলি পালন করে বেশি সাওয়াব, বরকত ও বেলায়াতের অধিকারী হতে পারেন সেজন্য তিনি এই ওযীফাগুলি মনোনিত করেন। এ বিষয়ে তিনি 'ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)' গ্রন্থে তাঁর বাণীতে বলেন:

"কুরআন সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর পথে চলে হৃদয়কে জাগতিক লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে আখেরাতমুখী করা ও আল্লাহর প্রেমে ভরে তোলাই তাসাউফ। কুরআন ও সুন্নাহর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন, হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন ও ফরয পালনের পরে নফল ইবাদতের মধ্য থেকে সহজ ও অধিকতর উপকারী কিছু ইবাদত বেছে দিয়ে, প্রয়োজনে ইবাদতে মনোযোগ ও তৃপ্তি অর্জনের জন্য কিছু রিয়াযাত বা অনুশীলন শিখিয়ে আগ্রহী মুসলিম বা মুরীদকে আল্লাহর পথে নিয়ে যাওয়ার পথই হলো "তরীকত"। ..... আমি আমার ওয়ালিদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর ও তাঁর মাধ্যমে আমার দাদাজী রাহিমাহুল্লাহু ও অন্যান্য সকল বুজুর্গ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তার সার সংক্ষেপ হলো কুরআন সুন্নাহর বাইরে কোনো তরীকত-তাসাউফ নেই। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত, কামালত বা বুজুর্গী নেই। তরীকত অর্থ শুধুমাত্র কিছু যিকির আযকার বা রিয়াযত নয়। ঈমান, আকীদা, আমল ও রিয়াযাতের সমম্বয় হলো তরীকত। আকীদা, তাকওয়া, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত আমল অপরিবর্তনীয়। কিন্তু রিয়াযাত, মুজাহাদা, উপকরণ বা অবলম্বনের পরিবর্তন ঘটে ও ঘটাতে হয়। যুগে যুগে যত তরীকত সৃষ্টি হয়েছে সবই এই রিয়াযাত ও নফল ওযীফার পরিবর্তন হেতু। কারণ নফল ইবাদত ও রিয়াযাতের পদ্ধতির মধ্যে কিছু রয়েছে জায়েয আর কিছু সুন্নাত। অনেক সময় প্রয়োজনের জন্য তরীকতের আমল বা রিয়াযাতের মধ্যে কিছু জায়েয বিষয় রয়ে যায়। এগুলিকে ক্রমান্বয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে উত্তরণ করার চেষ্টা করতে হয়। ...

আমি আমার পিতা ও পিতামহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আকীদা ও আমলকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছি। তাঁদের রেখে যাওয়া দাওয়াত, ইরশাদ ও সংস্কারের কাজ জোরদার করার চেষ্টা করেছি। আর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রিয়াযত ও ওযীফার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করেছি। তাঁদের শিক্ষার আলোকেই আমাকে এই পরিবর্তন করতে হয়েছে। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন যে, সুন্নাতের অনুসরণই কামালাতের একমাত্র পথ। তবে কিছু জায়েয বিষয় তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে বজায় রেখেছিলেন। আমিও অনেক জায়েয বিষয় বজায় রাখতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও সুন্নাতই উত্তম। সাথে সাথে আমি আমার দায়িত্ব ও সাধ্যের মধ্যে কিছু কিছু

বিষয়ে জায়েযের পরিবর্তে সুন্নাত পদ্ধতি প্রদানের চেষ্টা করছি। যেন মুরীদগণ বেশি সাওয়াব অর্জন করতে পারেন এবং তাঁদের জন্য কামালাতের পথ আরো সহজ ও নিশ্চিত হয়।"

রাহে বেলায়াত গ্রন্থে দেওয়া তাঁর বাণীতে তিনি বলেন: "সকলের কাছে আমার অনুরোধ যে, যদি আল্লাহর পথের পথিক হতে চান, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, রহমত, বরকত ও নাজাত লাভের আগ্রহ মনে থাকে তাহলে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখুন:

প্রথমত, বিশুদ্ধভাবে তাওহীদ ও রিসালতের উপর ঈমান আনুন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের আকীদা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা যা ইমাম আবু হানীফার (রহ) "ফিকহুল আকবার", ইমাম তাহাবীর (রহ) "আকীদায়ে তাহাবীয়া" ও অন্যান্য প্রাচীন ইমামগণের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই অনুসারে নিজেদের আকীদা গঠন করুন। পরবর্তী যুগের বিদ'আত ও বানোয়াট আকীদা বর্জন করুন। সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও ইলহাদ থেকে আত্মরক্ষা করুন।

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার হারাম উপার্জন পরিহার করুন। ফরয ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। সকল কবীরা গোনাহ ও হারাম বর্জন করুন। কোনো মানুষ অথবা প্রাণীর হক বা অধিকার নষ্ট করা বা ক্ষতি করা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন।

তৃতীয়ত, মনকে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মতৃপ্তি, জাগতিক সম্মান, প্রতিপত্তি বা টাকা-পয়সার লোভ থেকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা সতর্কতার সাথে চেষ্টা করুন। এজন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওফীক চেয়ে কাতরভাবে দু'আ করুন। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সাথে হাশি তামাশা বা গল্পগুজব যথাসম্ভব কম করুন।

চতুর্থত, নফল ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করুন। মানুষের সেবা, উপকার ও সাহায্য জাতীয় কাজ যথাসম্ভব বেশি করুন। নফল সালাত যথাসম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা করবেন। বিশেষত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও মাগরিবের পরে কিছু নফল সালাত (আওয়াবীন নামে পরিচিত) সর্বদা পালন করবেন।

নফল সিয়াম বেশি পালনের চেষ্টা করুন। বিশেষত প্রত্যেক সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথমে, শেষে এবং ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন। এছাড়া আরাফাতের দিনের সিয়াম ও আশুরার সিয়াম পালন করবেন। নফল দান বেশি করার চেষ্টা করবেন। দান করতে সক্ষম না হলে মানুষের বেশি বেশি সেবা ও উপকার করবেন, যা আল্লাহর নিকট দান হিসাবে গণ্য হবে। সকলেই কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিখে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবেন। সাথে সাথে অর্থ বুঝার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে নিয়মিত কয়েক পৃষ্ঠা তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রাখবেন।...আল্লাহর দরবারে দু'আ করি– তিনি যেন এই ওযীফার দ্বারা সকল যাকিরের পরিপূর্ণ উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং কবুল করে নেন।"

ফুরফুরার মারহূম পীর সাহেব 'রাহে বেলায়াত' ও 'ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্য থেকে বাছাই করা যে সকল ওযীফা পালনের জন্য নসীহত করেছিলেন এবং পালনকারীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন সেগুলি এই পুস্তকে সংকলন করা হলো। মহান আল্লাহর দরবারে আরযি করি, সুন্নাতে নববীর পালনে ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর অতুলনীয় নিরলস প্রচেষ্ট কবুল করে নিন, আমাদের পক্ষ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাদেরকেও সুন্নাতে নববীর পালনকারী ও খাদেম হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
ওযীফার আগে

(ক) বেলায়াত ও ওলী

বিলায়াত বা বেলায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব। 'বেলায়াত' অর্জনকারীকে 'ওলী' বা 'মাওলা', অর্থাৎ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী বা অভিভাবক বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর বন্ধুত্ব বা বেলায়ত লাভ করা ও আল্লাহর ওলী হওয়া সকল মুমিনের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আর বেলায়াত অর্জনের সুনিশ্চিত ও সহজ পথ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পথ।

ওলীদের পরিচয় প্রদান করে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে : "জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন।"[১]

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়। এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা (বিশ্বাস) বর্ণনা করে বলেন: "সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।[২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেলায়াতের পথের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। ফরয পালনের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা

---

[১] সূরা ইউনূস: ৬২-৬৩।
[২] ইমাম তাহাবী, আল-আকীদাহ (শারহ সহ), পৃ: ৩৫৭-৩৬২।

ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বার সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।"[৩]

তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদণ্ড ঈমান ও তাকওয়া। আর 'তরিকতে বেলায়াত' বা 'রাহে বেলায়াত' অর্থাৎ বেলায়াতের রাস্তা সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর যাবতীয় ফরয দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ পথে যিনি যতটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন।

আল্লাহর নিষেধ বর্জনকে মূলত তাকওয়া বলা হয়। এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরূহ বর্জনের গুরুত্ব বেশি। এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ- ই- আলফি সানী বলেনঃ *আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিক্র, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয ইবাদত তাহার সময় মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরুহ যদিও উহা 'তানজিহী' হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিক্র মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরূহে তাহরীমির কথা কী আর বলিব ! অবশ্য উক্ত কার্যসমূহ (যিক্র মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল মাকরুহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।*"[৪]

(খ) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

কুরআন কারীমে বারংবার ইরশাদ করা হয়েছে যে, উম্মাতের 'তাযকিয়া'ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল মিশন এবং 'তাযকিয়ায়ে নাফস'-ই সফলতার মূল। মহান আল্লাহ বলেনঃ "সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে 'তাযকিয়া' (পবিত্র) করবে এবং

---

[৩] সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।
[৪] মাকতুবাত শরীফ ১/১/ মাকতুব ২৯, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।

সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"[৫] আরো বলা হয়েছে: "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে 'যাকাত' (পবিত্রতা) অর্জন করে। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।"[৬]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে 'তাযকিয়া' (পরিশোধন) করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) শিক্ষা দেন।"[৭]

এখানে 'তাযকিয়া'-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তাযকিয়া শব্দটি 'যাকাত' থেকে গৃহীত। যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ সকল আয়াতে 'তাযকিয়া' অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাস ও নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তাযকিয়া করেন। তাবিয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন।[৮]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল কর্মই 'তাযকিয়া'-র অন্তর্ভুক্ত; কারণ সকল কর্মই মুমিনকে কোনো না কোনোভাবে পবিত্র করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। তবে এক্ষেত্রে হার্দিক বা মানসিক বিষয়গুলির প্রতি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনকে সকল মনোরোগের চিকিৎসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা।"[৯]

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়। জেনে রাখ তা অন্তঃকরণ।"[১০]

বস্তুত দীনের সকল কর্মই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কর্ম। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে। মনকে শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলি বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য,

---

[৫] সূরা শামস, ৯-১০।
[৬] সূরা আ'লা, ১৪-১৫ আয়াত।
[৭] সূরা আল-ইমরান, ১৬৪ আয়াত।
[৮] তাবারী, তাফসীরে তাবারী (জামিউল বাইয়ান) ১/৫৫৮।
[৯] সূরা ইউনূস, ৫৭ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা বানী ইসরাঈল, ৮২ আয়াত ও সূরা ফুস্‌সিলাত ৪৪ আয়াত।
[১০] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৮; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১২১৯।

কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণ-কামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলি করণীয় মানসিক কর্ম। এগুলির ফরয ও নফল পর্যায় আছে। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শির্ক, আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

(গ) ইহসান বা সৌন্দর্য ও পূর্ণতা

"ইহসান" শব্দের অর্থ কোন বিষয় সুন্দর করে পালন করা বা কারো উপকার ও কল্যাণ করা। যিনি "ইহসান" পালন করেন তিনি "মুহসিন"। কুরআন ও হাদীসে এই দুই অর্থে "ইহসান" ও "মুহসিন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীসে "ইহসান" বা সুন্দর ও পূর্ণ ইসলামের অধিকারী মুসলিমের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

আবু হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেন: "একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদের জন্য বাইরে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি এসে বলেন: ঈমান (বিশ্বাস) কী? তিনি বলেন: ঈমান এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপরে, তাঁর ফিরিশতাগণের উপরে, তাঁর গ্রন্থসমূহের উপরে, তাঁর সাথে সাক্ষাতের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে পুনরুত্থানের উপর। লোকটি বলেন: ইসলাম কী? তিনি বলেন: ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহ ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো শিরক করবে না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে। লোকটি বলেন: ইহসান (সৌন্দর্য বা পূর্ণতা) কী? তিনি বলেন: তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; কারণ তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।" উক্ত ব্যক্তির প্রস্থানের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এই ব্যক্তি জিবারাঈল (আলাইহিস সালাম), তিনি মানুষদেরকে দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।[১১]

(ঘ) বেলায়াত, তাযকিয়া ও ইহসানের পথ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বেলায়াত, তাযকিয়া ও ইহসান অর্জন করা মুমিনের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য এবং এগুলিই মূলত মুমিনের সফলতা। এই লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণতম আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তাঁর আদর্শের পূর্ণতম অনুসরণ করে 'তাযকিয়া' ও 'বেলায়াতের' সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তাঁর সহচরগণ। তাঁদের অনুকরণ-অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে মুমিনের বেলায়াতের পূর্ণতা। অনুকরণ-অনুসরণ আংশিক হলে তাযকিয়া ও বেলায়াতের লক্ষ্য অর্জনও আংশিক ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

---

[১১] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭-৪০।

(ঙ) ইবাদত কবুলের শর্ত

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল বা গৃহীত হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছে:

(১). বিশুদ্ধ ঈমান ও ইখলাস: শির্‌ক, কুফ্‌র ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। শুধু তাই নয়। উপরন্তু ইবাদতটি পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্যর সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

(২). সুন্নাতের অনুসরণ : কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত, রীতি ও তাঁর শিক্ষা অনুসারে পালিত হতে হবে। যদি কোনো ইবাদত তাঁর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাস, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতাই থাক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কোনো অবস্থাতেই গৃহীত বা কবুল হবে না।

(৩). হালাল ভক্ষণ : ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল-জীবিকা-নির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

(চ) নফল ইবাদতের গুরুত্ব

ফরযের অতিরিক্ত কর্মকে 'নফল' বলা হয়। কিছু সময়ে কিছু পরিমাণ 'নফল' ইবাদত পালন করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। এগুলিকে 'সুন্নাত'-ও বলা হয়। উপরের হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, ফরয ইবাদত পালনের পরে সদা-সর্বদা সুন্নাত-নফল ইবাদতে রত থাকাই বেলায়াত, তাযকিয়া ও ইহসানের পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনে আমরা এই আদর্শই দেখতে পাই। ফরয ইবাদত পালরের পরে তাঁরা বেশি বেশি নফল সিয়াম, নফল সালাত, নফল দান, নফল যিক্‌র ও অন্যান্য নফল ইবাদতে সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন।

কিন্তু অনেকে তরীকত, তাযকিয়া বা ওযীফার নামে বিভিন্ন নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু ফরয-ওয়াজিব ইবাদতে অবহেলা করেন। এভাবে ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা ভণ্ডামি বা বোকামি। এজন্য বেলায়াত ও তাযকিয়ার পথের কর্মগুলির পর্যায় বুঝা প্রয়োজন। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আমরা দেখি যে, তাযকিয়া ও বেলায়াতের পথের কর্মগুলির পর্যায়, তথা মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায়গুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, ঈমান : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলে পরবর্তী সকল নেক কর্ম ও ধার্মিকতা পণ্ডশ্রম ও বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন : মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, জুয়া, ফাঁকি, ধোঁকা, ভেজাল, পরিমাপ বা পরিমানে কম দেওয়া, জুলুম, জোরপূর্বক গ্রহণ ইত্যাদি উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়ত, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন : কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম। ফরয কর্ম দুই প্রকার : প্রথম প্রকার যা করা

ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয, যা "হারাম" নামে অভিহিত। হারাম দুই প্রকার : এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

পঞ্চমত, ফরয কর্মগুলি পালন।

ষষ্ঠত, মাকরূহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন।

সপ্তমত, সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

অষ্টমত, ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠককে 'রাহে বেলায়াত' গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(ছ) অবহেলিত কয়েকটি ফরয ও হারাম

ফরয ইল্‌ম, আকীদা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, ফরয পোশাক ও পর্দা, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত (যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত, নফল যিক্‌র ইত্যাদি পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না। আমাদের দেশে অনেক মানুষ আল্লাহর পথে চলতে চান এবং অনেক ফরয ও নফল ইবাদত করেন, কিন্তু অসাবধানতা বশত অনেক ফরয ইবাদত তাঁরা পরিত্যাগ করেন। এগুলির মধ্যে কিছু করণীয় ফরয ও কিছু বর্জনীয় ফরয বা হারাম কর্ম রয়েছে। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।

(১) পর্দা

মানব দেহের কিছু অংশ 'গুপ্তাঙ্গ' বা 'আউরাত' (Private parts) বলে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। এগুলি অন্য মানুষদের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। পুরুষদের জন্য সদাসর্বদা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। এই অংশটুকু স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো হারাম। মহিলাদের পোষাকের মূলত ৪টি স্তর রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন পোষাকের বাধ্যবাধকতা নেই। অন্য মুসলিম মহিলাদের দৃষ্টি থেকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান আবৃত করে রাখা মুসলিম মহিলার জন্য ফরয। পিতা, আপন চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগিনেয়, শ্বশুর প্রমুখ মাহরাম (বিবাহ সম্ভব নয়) আত্মীয়দের সামনে মোটামুটি কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর আবৃত করতে হবে। বাকী সকল পুরুষের দৃষ্টি থেকে মুসলিম মহিলা মাথার চুল, মাথা, কাঁধ, কান ও গলাসহ পুরো শরীর আবৃত করে রাখবেন। এগুলি তাদের সামনে অনাবৃত করা হারাম ও কঠিন গোনাহের কারণ। আমরা এতটুকুই বুঝতে পারি যে, যেখানে যতটুকু আবৃত করা ফরয তা আবৃত করলে সাওয়াব হবে এবং অনাবৃত রাখলে কঠিন গোনাহ হবে।

উপরন্তু কোনো মহিলা যদি হাতের কব্জি ও মখমণ্ডল ছাড়া অন্য কিছু- যেমন চুল, কান, গলা ইত্যাদি অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করেন, তবে অন্য কোনো মানুষ না দেখলেও তার সালাত আদায় হবে না।

অভিভাবকের জন্য নিজের পর্দা পালন যেমন ফরয, তেমনি নিজের কন্যা, স্ত্রী, ভগ্নি বা নিজের দায়িত্বাধীন সকল মহিলার পর্দা করানো ফরয। আমাদের দেশের অনেক ধার্মিক মুসলিম পুরুষদের সুন্নাতী পোশাকের বিষয়ে সচেতন হলেও মেয়েদের 'সুন্নাতী' তো দূরের কথা, 'ফরয' পোশাকের বিষয়েও সচেতন নন। পুরুষদের সাধারণ পোশাক, সুন্নাতী পোশাক এবং মহিলাদের পর্দা ও সুন্নাতী পোশাকের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা **'কুরআন সুন্নাহের আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা'** পুস্তকটি পাঠ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

(২) সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা

মুমিনের অন্যতম ফরয দায়িত্ব পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন মানুষের অধিকার আদায় করা। এক্ষেত্রে অবহেলা করা, কারো পাওনা না দেওয়া বা কারো ক্ষতি করা কঠিন হারামগুলির অন্যতম। এগুলির মধ্যে রয়েছে: পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, আনুগত্য ও সেবার ক্ষেত্রে অবহেলা, সন্তানের প্রতিপালন, ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক ইসলামী শিক্ষা দান ও ইসলামী চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে অবহেলা করা, স্ত্রীর সম্মানজন ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সময় প্রদান ও স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার আদায়ে অবহেলা করা, স্বামীর আনুগত্য, সেবা, সংসারের সংরক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্বে অবহেলা করা।

অনুরূপভাবে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী, সমাজের সাধারণ মানুষ, দুর্বল শ্রেণী, এতিম, দরিদ্র, ক্রেতা, বিক্রেতা, কর্মদাতা, কর্মচারী এবং সকলের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। এগুলি সম্পর্কে অবহেলা কঠিন কবীরা গোনাহ। এছাড়া এ জাতীয় গোনাহ আল্লাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা ছাড়া পুরোপুরি ক্ষমা করেন না।

(৩) গীবত বা পরনিন্দা করা বা শোনা

অন্য মানুষের অধিকার নষ্টের একটি বিশেষ দিক গীবত বা পরনিন্দা করা। কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার কোনো সত্যিকারের দোষত্রুটি বলাই ইসলামের পরিভাষায় গীবত। যেমন,– একজন মানুষ বেটে, রগচটা, অহঙ্কারী, তোতলা, বিলাসী, অল্প শিক্ষিত, জামাত কাযা করে, ধুমপান করে, স্ত্রী পর্দা করে না, মদখোর, ঘুষখোর, জালিম ... দীনের অমুক কাজে অবহেলা করে ... , ইত্যাদি কোনো দোষ বা দৃষ্টিকটু বিষয় সত্যিই তার মধ্যে রয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে তার এই দোষ উল্লেখ করা গীবত ও কঠিন পাপ। পাপী বা অন্যায়কারী ব্যক্তিকে সরাসরি তার পাপ থেকে নিষেধ করা বা উপদেশ দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই ভাল কাজ। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পাপের বা অন্যায়ের কথা অন্যকে বলা কঠিন কবীরা গোনাহ ও হারাম। গীবত শোনাও একইরূপ পাপ। কারো গীবত করা হলে তার প্রতিবাদ করা মুমিনের দায়িত্ব।

মুমিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ গীবত। কুরআনে গীবতকে 'মৃতভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে অগণিত হাদীসে উম্মতকে সাবধান করেছেন। সবচেয়ে কঠিন বিষয় গীবত করা বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট পাপ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এই অপরাধের কারণে আমাদের পুণ্য তাকে প্রদান করতে হবে। কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে আলোচনা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করাই মুমিনের নাজতের একমাত্র উপায়। আমাদের নিজের গোনাহ ও ভুলভ্রান্তির কথা চিন্তা করতে হবে এবং অন্যের কথা চিন্তা করা বা অন্যের দোষত্রুটি নিয়ে চিন্তা করা যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে।

(৪) নামীমাহ্ বা চোগলখুরী

গীবতের আরেকটি পর্যায় 'নামীমাহ', 'চোগলখুরী' অর্থাৎ কানভাঙ্গানো বা কথা লাগান। একজনের কাছে অনুপস্থিত কারো কোনো দোষত্রুটি আলোচনা গীবত। আর যদি এমন দোষত্রুটি বা কথা আলোচনা করা হয় যাতে দুই ব্যক্তি মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে তাকে আরবীতে 'নামীমাহ' বলা হয়। এটি গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্যতম কবীরা গোনাহের একটি। সত্য কথা লাগানোও নামীমাহ, যেমন সত্য দোষ বলা গীবত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "চোগলখোর বা কানভাঙ্গানিতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১২]

মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্য কথা বলা জায়েয, কিন্তু সম্পর্ক নষ্টকারী সত্য কথা জায়েয নয়। এছাড়া এসকল গীবত ও নামীমাহতে লিপ্ত মানুষদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। যদি কেউ আপনার কাছে এসে আপনার কোনো ভাই সম্পর্কে এধরনের কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দিন। এই লোকটি চোগলখোর। সে সত্যবাদী হলেও আপনার শত্রু। আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি, প্রবিত্রতা ও আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়। আল্লাহ আমাদেরকে চোগলখোরী ও চোগলখোর থেকে হেফাযত করুন ; আমীন।

(৫) ঝগড়া-তর্ক

আল্লাহর পথের পথিক বা ধার্মিক মানুষদের জন্য শয়তানের একটি ফাঁদ ঝগড়া ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। ধার্মিক মানুষেরা অনেক সময়েই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-তর্কে জড়িয়ে পড়েন। আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে বিতর্ক এড়িয়ে চলার। ধর্মীয় আলোচনার দায়িত্ব আলিমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। একান্তই বাধ্য হলে আমরা আলোচনায় লিপ্ত হব, কিন্তু ঝগড়ায় লিপ্ত হব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা

---

[১২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৫০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০১।

হবে। আর যার আচরণ সুন্দর ও অমায়িক তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[১৩]

(জ) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কিছু কর্ম

আমরা দেখেছি যে, অন্তরের পরিশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নাফ্স ইসলামের মূল নির্দেশনা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম শিক্ষা। বিভিন্ন দৈহিক ইবাদত এই পরিশুদ্ধি অর্জনের পথে সহায়ক। তবে মানসিক কর্মের গুরুত্ব এক্ষেত্রে বেশি। মানসিক কর্মের সাওয়াব ও গোনাহ যেমন অনেক বেশি, তেমনি আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে তার প্রভাবও বেশি।

প্রথমত, বর্জনীয় মানসিক কর্ম

দৈহিক ইবাদতের মত মানসিক ইবাদতেরও বর্জনীয় ও করণীয় দুটি দিক রয়েছে। অনেক সময় আল্লাহর পথে চলতে সচেষ্ট ও ধর্ম-সচেতন অনেক মানুষ দৈহিক হারাম থেকে সতর্ক থাকলেও মানসিক হারাম থেকে সতর্ক হতে পারেন না। তাঁরা ব্যভিচার, মিথ্যা, মদপান, সালাত বা সিয়াম পরিত্যাগ ইত্যাদি পাপে কখনোই লিপ্ত হন না। কখনো এরূপ কিছু করলে সকাতরে তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকেন। কিন্তু জেনে অথবা না জেনে তাঁরা বিভিন্ন মানসিক পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

এর কারণ, কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই শয়তান কখনো নিরাশ হয় না। প্রত্যেক মানুষকেই কোনো না কোনোভাবে বিভ্রান্ত করতে ও পাপে লিপ্ত করতে সে সদা সচেষ্ট। সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য তার নিজস্ব পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী রয়েছে। সবাইকেই সে পরিপূর্ণ ধর্মহীন অবিশ্বাসী করতে চায়। যাদের ক্ষেত্রে সে তা করতে সক্ষম না হয় তাদেরকে সে দুভাবে পাপের মধ্যে নিপতিত করতে চেষ্টা করে: প্রথমত 'ধর্মের আবরণে' পাপ ও দ্বিতীয়ত 'অন্তরের পাপ'।

ধর্মের আবরণে পাপকে ইসলামী পরিভাষায় 'বিদ'আত' বলা হয়। বিদ'আতের পরিচয় ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'সুন্নাতের' বিপরীত 'বিদ'আত'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ যে কর্ম 'দীন' বা 'সাওয়াব' হিসেবে করেন নি সেই কর্মকে 'দীনের' অংশ বা 'সাওয়াবের' বিষয় বলে মনে করা বা পালন করাই বিদ'আত।

দ্বিতীয় প্রকারের পাপ অন্তরের পাপ নেককার মানুষের নেক-আমল নষ্ট করে দেয়, অথচ সেগুলিকে অনুধাবন করা অনেক সময় ধার্মিক মানুষের জন্যও কষ্টকর হয়ে যায়। আমরা এখানে সংক্ষেপে এ জাতীয় কিছু পাপের কথা আলোচনা করতে চাই।

(১) প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আত্মতৃপ্তি

আরবী হাওয়া (الهوى) অর্থ 'প্রবৃত্তি', 'মন-মর্জি' বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ। অন্তরের ব্যাধিসমূহের অন্যতম 'প্রবৃত্তি' বা নিজের পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ ও

---

[১৩] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৭৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩২।

আনুগত্য। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা। তবে নিজের ইচ্ছামত নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পন করাই ইসলাম। ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণের অর্থ বিশ্বাস বা কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) কোনো নির্দেশ, শিক্ষা বা সুন্নাত অবগত হওয়ার পরে কোনো যুক্তি, তর্ক বা অন্য কোনো অজুহাতে তা পরিত্যাগ করা বা ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেওয়া। মুমিনের নাজাতের একমাত্র উপায় যে, নিজের মন-মর্জিকে সুন্নাতের অনুগত করে নেওয়া। কুরআন বা হাদীসের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা যদি নিজের পছন্দ-অপছন্দের বাইরে হয়, অথবা নিজের বা সমাজের প্রচলিত কর্মের বিপরীত হয়, তবে নিজের রুচি পরিবর্তন করে তাকে সুন্নাতের অনুগত করতে হবে। বিভিন্ন অজুহাতে সুন্নাত পরিত্যাগের প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন: "আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তাঁর নিজের পছন্দ অপছন্দ বা নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? আপনি কি তার উকিল হবেন?"[১৪] অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে : "তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত ব্যতিরেকে নিজের প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত প্রদান করেন না।"[১৫]

প্রবৃত্তির অনুসরণের একটি বিশেষ দিক নিজের মত বা কর্মের প্রতি পরিতৃপ্ত থাকা বা নিজেকে নির্ভুল ও ভাল মনে করা। মুমিনের দায়িত্ব নিজের ভুল হতে পারে বলে সর্বদা খেয়াল রাখা এবং কখনোই নিজেকে 'ঈমানে-আমলে' ভাল বলে তৃপ্ত না হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে : অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতামতের প্রতি তৃপ্তি ও আস্থা।"[১৬]

(২) অহঙ্কার

নিজেকে অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে উন্নত, ভালো, উত্তম বা বড় মনে করা, অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে করাই কিবর, তাকাব্বুর বা অহঙ্কার। এটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি, তবে কর্মের মধ্যে অনেকসময় তার কিছু প্রভাব থাকে। অহঙ্কার একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর অধিকার। কোনো মানুষের অহঙ্কার করাটা মূলত আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ। কারণ, অহঙ্কারের বিষয় সর্বদা আল্লাহর নিয়ামতেই হয়।

পৃথিবীর সকল নিয়ামত আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে প্রদান করেন না। কাউকে দেন, কাউকে দেন না অথবা কমবেশি প্রদান করেন। যিনি নিয়ামত পেয়েছেন তার দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু যদি তিনি এই নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বা ভিক্ষা হিসাবে গ্রহণ না করে নিজের নিজস্ব উপার্জন ও সম্পদ

[১৪] সূরা ফুরকান, ৪৩ আয়াত।
[১৫] সূরা আল-কাসাস, ৫০ আয়াত।
[১৬] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/২৩০, আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৭।

মনে করেন তখনই অহঙ্কারের শুরু হয়। এতে প্রথমেই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

অহঙ্কার সকল ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক অনুভূতি। তবে তা যদি ইবাদত কেন্দ্রিক হয় তাহলে তা আরো বেশি ক্ষতিকারক। নিজেকে ভালো দীনদার মনে করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। সাথে সাথে যদি নিজেকে অন্য কোনো মুসলমানের চেয়ে বেশি দীনদার মনে করা হয় তাহলে ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

মুহতারাম পাঠক, কিয়ামতের হিসাব নিকাশ শেষে জান্নাতে প্রবেশের আগে কখনো কোনো মুমিন নিজের নাজাত সম্পর্কেই নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম বা বেশি ধার্মিক ভাবা তো দূরের কথা! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৭]

অহঙ্কার অন্তরের কর্ম হওয়ার কারণে আমরা সহজে তা ধরতে পারি না। আমরা মনে করি যে, আমার মধ্যে অহঙ্কার নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান। বিভিন্নভাবে তা যাচাই করা যায়। অতি সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় মানুষের মধ্যে বেরোতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়? এরূপ পোশাক পরিহিত অবস্থায় যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আপনাকে দেখে ফেলেন তবে কি খুব সংকোচ বোধ হয়? যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে, মনের মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান। কোনো সমাবেশ বা মাজলিসে পিছনে বা নিচে বসতে হলে কি আপনার খারাপ লাগে? মনের মধ্যে কি আশা হয় যে, কেউ আপনাকে ডেকে সম্মান করুক, আগে সালাম দিক? যদি হয় তবে বুঝবেন যে, অহঙ্কার অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে।

অন্তরের মধ্যে অহঙ্কারের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য মুমিনকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। যে সকল কর্ম করলে 'ছোট' হয়ে যাব বলে মনে হয়, সেগুলি মাঝে মাঝে করতে হবে। যেমন নিম্নমানের পোশাক বা বাহন ব্যবহার করা, নিম্নমানের বাজার করা ইত্যাদি। তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা বলেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) মাথায় এক বোঝা খড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এ কাজ করছেন? আল্লাহ তো আপনাকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, যাতে এমন না করলেও আপনার চলে? তিনি বলেন, আমি অন্তরের অহংবোধকে আহত করতে চাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যার অন্তরে শরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" হাদীসটি হাসান।[১৮]

(৩) হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা

অহঙ্কারের পাশাপশি মানব হৃদয়ে সবচেয়ে নোংরা ও ক্ষতিকারক কর্ম হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অমঙ্গল কামনা, পারস্পারিক শত্রুতা, ইত্যাদি। হৃদয়ে এগুলির উপস্থিতি হৃদয়কে কলুষিত করে, ভারাক্রান্ত করে, আল্লাহর যিক্‌র থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং

---

[১৭] সহীহ মুসলিম ১/৯৩, নং ৯১।

[১৮] হাকিম, আল-মুসতাদরা ৩/৪৭০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৯।

সর্বোপরি অন্যান্য নেক আমল নষ্ট করে দেয়। হাদীসের আলোকে মুসলমান মুসলমানে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার দুটি ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জানতে পারি: (১) আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয় (২) সকল নেক কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করে দেয়।

অনেক সময় নেককার মানুষেরা অন্যায়ের প্রতি ঘৃণার নামে হিংসার মধ্যে নিপতিত হন। আমাদের দায়িত্ব অন্যায় ও পাপের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। কিন্তু কোনো মুমিনকে এরূপ পাপ বা অন্যায়ের জন্য ঢালাওভাবে ঘৃণা করা যায় না। কারণ মুমিনের মধ্যে বিদ্যমান ঈমান ও অন্যান্য ভাল বিষয়ের জন্য তাকে ভালবাসাও আমাদের দায়িত্ব। পাশাপাশি পাপের জন্য আমাদের মনে বেদনা থাকবে।

ঘৃণা অর্থ হিংসা নয়। ভালবাসার সাথে এই ঘৃণা একত্রিত থাকে। মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক সিটকায় ও তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু এই ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা। মুমিনের প্রতি মুমিনের ভালবাসার অবস্থাও তদ্রূপ। এছাড়া পাপের প্রতি ঘৃণা এবং নিজেকে পাপীর চেয়ে উত্তম মনে করে অহঙ্কার করা এক নয়। সর্বোপরি মুমিন নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকবেন। অন্যের কথা চিন্তা করা থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে।

(৪) প্রদর্শনেচ্ছা ও সম্মানের আগ্রহ

মুমিন তার সকল কর্ম কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর জন্য বা কারো নিকট থেকে প্রশংসা, সম্মান বা পুরস্কার লাভের জন্য কর্ম করাকে 'রিয়া' বলা হয়। বাংলায় আমরা একে 'প্রদর্শনেচ্ছা' বলতে পারি। মুমিনের সকল ইবাদত ধ্বংস করার ও তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল ইবাদত গোপনে করা। তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই করতে হবে। রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ দেওয়া যাবে না। রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। কখনো এসে গেলে বারংবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে।

রিয়ার অন্যতম কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা। আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না। সকলেই আমার মতই অক্ষম। যে মানুষকে দেখানো জন্য, শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি সে আমার মতই অসহায় মানুষ। আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে। হয়ত তার প্রশংসা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে। অথবা প্রশংসা করার আগেই তার মৃত্যু হবে। আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার মালিক ও

পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেশপালের যে ক্ষতি করবে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে।"[১৯]

দুনিয়ার সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি একটি কঠিন বোঝা ও ফিতনা ছাড়া কিছুই নয়। সম্মান ও প্রতিপত্তিহীন মানুষের অন্তর বিনয় ও সরলতায় ভরা থাকে। ফলে আল্লাহর বেলায়াত অর্জন তাদের জন্য খুবই সহজ হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অধিকাংশই এরূপ সাধারণ মানুষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "অনেক মানুষ এমন আছেন যার মাথার চুল এলোমেলো, পদযুগল ধুলিধসরিত, পরণের কাপড় অতি-সাধারণ এবং সমাজে তাদেরকে কোনো গুরত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা এত বেশি যে, যদি তিনি শপথ করে আল্লাহর কাছে কিছু দাবি করেন তবে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন।"[২০]

(৫) অকারণ মানসিক ব্যস্ততা

আল্লাহর যিক্র মানব হৃদয়ের খাদ্য ও আত্মার পাথেয়। যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন সবসময় আল্লাহর রহমত, নিয়ামত, করুণা, বরকত, বিধান, পুরস্কার, শাস্তি, তাঁর প্রশংসা, মর্যাদা, একত্ব ইত্যাদির স্মরণ করে হৃদয়কে পবিত্র, প্রশান্ত ও শক্তিশালী রাখতে। আল্লাহর যিক্র থেকে মনকে সরিয়ে রাখে এরূপ বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। যে সকল পত্র পত্রিকা, বই-পুস্তকে ইসলাম, মুসলিম, আলিম-উলামা বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখা হয় সেগুলি পড়বেন না। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানো পরিহার করে আল্লাহর কাছে দু'আ ও যিকরে সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয়ত, অর্জনীয় মানসিক কর্ম

(১) আল্লাহ্ ও রাসূলের (ﷺ) মহব্বত

আল্লাহর প্রিয় হার্দিক কর্মের অন্যতম ভালবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে। এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সকল মুমিনকে ভালবাসতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে, প্রথম বিষয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অন্য সকলের চেয়ে তার নিকট বেশি প্রিয় হবেন।"[২১] তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে

---

[১৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৮৮। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।
[২০] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৬৯২। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।
[২১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪, ১৬, ৬/২৫৪৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৬।

আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসবে।'[২২]

ভালবাসা অর্জনের অন্যতম উপায় সাহচার্য ও অনুকরণ। সাহাবীগণ এভাবেই সত্যিকারের নবীপ্রেম অর্জন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালের নবীপ্রেমিকগণ দৈহিক সাহচার্য না পেলেও সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীস পাঠ, তাঁর ও তাঁর সহচরদের জীবনী পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর রূহানী সাহচার্য লাভ করে তাঁর ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরই হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করে হৃদয়ের মধ্যে এই ভালবাসাকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ করেছিলেন তাঁরা। আমাদেরও এপথে এগোতে হবে।

(২) সকল মুমিনের প্রতি মহব্বত ও কল্যাণ কামনা

হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে মুক্ত রাখা এমন একটি কর্ম যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও যিক্‌র আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যদি কেউ তার হৃদয় হিংসামুক্ত রাখতে পারে তবে সে জান্নাতী হবে।[২৩] অন্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, হিংসামুক্ত হৃদয়ের অধিকারী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য লাভ করবে।[২৪]

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, সংঘাতপূর্ণ জীবনে অনেক মানুষ আমাদেরকে কষ্ট দেন, হক্ক নষ্ট করেন, ক্ষতি করেন বা শত্রুতা করেন। অনেকে অকারণেও এগুলি করেন। এদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে হৃদয়কে কিভাবে বিরত রাখব? আসলে বিষয়টি কঠিন বলেই তো সাওয়াব বেশি। তবে চেষ্টা করলে তা কঠিন থাকে না। মানবীয় স্বভাবের কারণে আমাদের মনে বিশেষ মুহূর্তে ক্রোধ, কষ্ট বা বিরক্তি আসবেই। তবে মনটা একটু শান্ত হলেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্য থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ও যার কর্মে বা ব্যবহারে আমরা কষ্ট পেয়েছি তার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে ও দু'আ করতে হবে।

প্রয়োজনে নিজের হক্ক রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা বা কর্ম আর মনের হিংসা ও শত্রুতা এক নয়। এক ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করেছেন, আমি তার নিকট থেকে আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু তার সাথে আমার অন্য কোনো শত্রুতা নেই। আমি আমার অধিকার ফেরৎ পাওয়া ছাড়া তার কোনো প্রকার অমঙ্গল কামনা করি না। বরং আমি সর্বদা তার জন্য দু'আ করি। এভাবে হৃদয়কে অভ্যস্ত করলে ইন্‌শা আল্লাহ আমরা এই মহান গুণ অর্জন করতে পারব।

(৫) ধৈর্যধারণ ও সুন্দর আচরণ

মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহজেই অত্যন্ত বেশি সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সবর বা ধৈর্যধারণের গুণ অর্জন করা। ধৈর্য মুমিনের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের

---

[২২] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪, ৬/২৪৪৫; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৭।

[২৩] মুসনাদু আহমদ ৩/১৬৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭৮-৭৯, মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৭/১৮৭, ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ ৬/১২১।

[২৪] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬, নং ২৬৭৮।

অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নির্জীবতা বুঝানো হয় না, বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝানো হয়। পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা। এক কথায় Re-active না হয়ে Pro-active হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "ধৈর্য ও উদারতাই সর্বোত্তম ঈমান।" হাদীসটি সহীহ।[২৫]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্য তিন প্রকারের: (১) বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য, (২) পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং (৩) ক্রোধের মধ্যে ধৈর্য। তিন ক্ষেত্রেই ধৈর্যধারণ জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। আবূ দারদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন: "তুমি ক্রোধান্বিত হবে না তাহলেই জান্নাত তোমার প্রাপ্য হবে।"[২৬]

ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্রোধের সময় আত্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তন্মধ্যে রয়েছে, ক্রোধান্বিত হলে 'আউযু বিল্লহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা, আল্লাহর ক্রোধের কথা স্মরণ করা, উত্তেজিত অবস্থায় কথা না বলে চুপ করে থাকা, মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা, ওজু করা, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে শয়ন করা ইত্যাদি।

ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যার কারণে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে বা যে কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে ও তার সাথে উত্তম আচরণ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তার মর্যাদা রক্ষা করবেন ও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বিরক্তি ও ক্রোধে উত্তেজিত অবস্থায় যদি কেউ রাগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সম্বরণ করে তবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার হৃদয়কে পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবেন।" হাদীসটি হাসান।[২৭]

ধৈর্যের মাধ্যমেই আমরা উত্তম আচরণের গুণ অর্জন করতে পারি। আর সমাজের সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয়তম ইবাদতসমূহের অন্যতম। আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর-অমায়িক আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম পালন করার সাওয়াব অর্জন করবে।[২৮]

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের

---

[২৫] আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৩/৪৮২, নং ১৪৯৫।
[২৬] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭০। হাদীসটির সনদ সহীহ।
[২৭] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১; আলবানী, সহীহুল জামি ১/৯৭।
[২৮] হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২২; আলবানী, সহীহুল জামি ২/৯৯৮।

তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমত: কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিনম্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শ্রবণ করা। দ্বিতীয়ত, কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে গালি গালাজ, অভিশাপ ও সীমালঙ্ঘণ বর্জন করা। তৃতীয়ত, ক্ষমা করা, বিশেষত প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে ক্ষমা করে দেওয়া। এইরূপ আচরণের অধিকারী কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সবচেয়ে নৈকট্যের মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর এর বিপরীত আচরণের অধিকারী সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে থাকবেন।[২৯]

(৬) আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ

অন্তরের একটি সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর সু-ধারণা পোষণ করা ও সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশায় হৃদয়কে ভরপুর রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহর সর্বোত্তম ইবাদতের অন্যতম।"[৩০]

যত কঠিন বিপদ বা সমস্যাই আসুক না কেন, মুমিনের হৃদয়ে অবিচল আস্থা থাকে যে, তার করুণাময় দয়াময় প্রতিপালক তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তারই ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচল আস্থার সামান্যতম ঘাটতি ঈমানেরই ঘাটতি। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, হতাশা বা অবসাদে আক্রান্ত হওয়া অবিশ্বাসেরই নামান্তর। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে: "একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।"[৩১]

ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তা শয়তানের বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্য। মহান করুণাময় আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন: "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বরকত-রহমতের অঙ্গীকার করেন।"[৩২]

সাম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, প্রকৃত বিপদের ক্ষেত্রেও মুমিন কখনোই হতাশ হন না। কারণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।"[৩৩]

এজন্য মুমিন বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলে এই ভেবে খুশি হন যে, এই কষ্ট মূলত আগত স্বস্তিরই পূর্বাভাস মাত্র। মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলি তাঁর রহমতের আশায় ভরে দিন এবং সকল হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত রাখুন।

(৭) কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি

শুক্‌র অর্থ কৃতজ্ঞতা, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা'আত অর্থ স্বল্পে তুষ্টি। এই

---

[২৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৭০। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩০] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৮ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/৩৯৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৮৫; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৩১। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

[৩১] সূরা ইউসূফ, ৮৭ আয়াত।

[৩২] সূরা বাকারা, ২৬৮ আয়াত।

[৩৩] সূরা আলাম নাশরাহ, ৫-৬ আয়াত।

তিনটি কর্মে মুমিনের মনকে অভ্যস্ত করতে হবে। এগুলি দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত নিয়ামতের উৎস। আল্লাহ বলেন: "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।"[৩৪]

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগণিত নেয়ামত রয়েছে। আবার অনেক কষ্টও রয়েছে। আমরা কখনোই কষ্ট ও অসুবিধাগুলিকে বড় করে দেখব না। কষ্টের কথা বারংবার মনে করে জাবর কাটব না। বরং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, শান্তি, সুখ বারংবার স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আল্লাহর অগনিত নিয়ামতের মধ্যে কিছু কষ্টের কারণে যদি গোনাহ ক্ষমা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা কী? দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপদাপদ ও অসুবিধা আসে। কাজেই আমার জীবনে তো কিছু অসুবিধা থাকবেই। বিপদ ও সমস্যা তো আরো কঠিন হতে পারত। অনেকের জীবনেই তো আমার চেয়েও অধিক কষ্ট আছে। কাজেই আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সম্পদে, শক্তিতে বা রিয্‌কে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকেও দৃষ্টি করে। তাকে আল্লাহ যে নিয়ামতে দিয়েছেন তার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন থেকে আত্মরক্ষার উপায় এটি।"[৩৫]

অতি সামান্য নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[৩৬]

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি, বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি সামান্যতম সহযোগিতা করেন তবে আমাদের দায়িত্ব, তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেওয়া। না হলে তার জন্য দু'আ করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৮) নির্লোভতা ও আখিরাতমুখিতা

যুহদ অর্থ নির্লোভতা, নির্লিপ্ততা, কৃচ্ছতা, বৈরাগ্য ইত্যাদি। ইসলামে সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগের বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে অবস্থান করে জাগতিক সম্পদ ও সম্মানের লোভ থেকে হৃদয়কে বিমুক্ত রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সম্মান ও অসম্মান সকল অবস্থায় হৃদয়ের অবস্থা এক থাকাই ইসলামী বৈরাগ্য। আল্লাহ যখন যেভাবে রাখবেন তখন সেই অবস্থায় বান্দা তার দায়িত্বগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকবেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে বান্দা যথাসাধ্য আখিরাতের পাথেয় অর্জনের চেষ্টা করেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি না

---

[৩৪] সূরা ইবরাহীম, ৭ আয়াত।
[৩৫] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৭৫; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৪৫।
[৩৬] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/২৭৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২১৭। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

থাকলে বান্দা ভারমুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নিরিবিলি আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। যে কোনো সময়ে তার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ আবাসে গমনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।

এই জগতে মুমিন একজন পথচারী বা প্রবাসী মাত্র। বাস, রেল বা বিমানে ভাল সিট পেতে চান যাত্রী, কিন্তু ভাল সিট না পেলে দুশ্চিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করেন না। যে সিট পেয়েছেন তাতে বসেই নিজের গন্তব্যস্থলে গমন করেন। পথের সৌন্দর্য ও শান্তি তাকে আনন্দিত করে। কিন্তু পথের কষ্ট তাকে হতাশ করে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমরা দেখলাম যে, তার দেহে চাইয়ের দাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা বানিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, "আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! দুনিয়াতে আমার অবস্থা অবিকল সেই আরোহীর মত, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে এবং এরপর গাছটি ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে।"[৩৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তুমি দুনিয়াতে এমন হও, যেন তুমি প্রবাসী অথবা পথচারী। ইবনু উমার বলতেন, যখন সন্ধ্যা হবে, তখন তুমি পরবর্তী সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এই অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে তখন তুমি পরবর্তী সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না। তোমার সুস্থতা থেকে তুমি তোমার অসুস্থতার পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তোমার জীবন থেকে তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ কর।"[৩৮]

সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুনিয়ার বিষয়ে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন, আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।" হাদীসটি সহীহ।[৩৯]

প্রতিদিন সুযোগ পেলেই জীবনের অস্থায়িত্ব ও আখিরাতের স্থায়িত্ব স্মরণ করতে হবে। চলেই যখন যেতে হবে, তখন যে কয় দিন থাকি কল্যাণ ও ভালবাসার মধ্যে থাকি। আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। হানাহানি, হিংসা, প্রতিহিংসা বা লোভ করে কি লাভ হবে? আমি কি এ সবের ফল ভোগ করতে পারব? কতদিনই বা এগুলি ভোগ করব? কি দরকার ক্ষণস্থায়ী হিংসা, প্রতিহিংসা বা লোভের জন্য চিরস্থায়ী অকল্যাণ ও অমঙ্গল গ্রহণ করার?

---

[৩৭] তিরমিযী, ৪/৫৮৮। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[৩৮] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৫৮।
[৩৯] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৭৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩৪৮; আলবানী, সহীহুল জামি ১/২২০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ নেক আমলের ওযীফা

(ক) ওযীফার পরিচয় ও গুরুত্ব

'ওযীফা' অর্থ দৈনন্দিন বা নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্ম বা কর্মসূচী। দৈনন্দিন বেতন বা রেশনকেও আরবীতে অযীফা বলা হয়। এই অর্থে মুমিনের জীবনের ফরয ও নফল সকল নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্মই ওযীফা। তবে সাধারণভাবে আমরা 'ওযীফা' বলতে 'সুন্নাত-নফল' ইবাদতের 'ওযীফা'-ই বুঝি। কারণ 'ফরয-ওয়াজিব' ইবাদতের 'ওযীফা' তো আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তাতে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। সকল দেশের সকল মুসলিমের জন্যই 'ফরয ওযীফা' একই প্রকারের। 'সুন্নাত-নফল' ইবাদতের ওযীফার ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য কিছু 'নিজস্ব কর্মচূচী'-র সুযোগ আছে। হাদীসে 'ওযীফা'কে 'হিযব' বলা করা হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, ফরয ইবাদত পালনের সাথে সাথে অবিরত নফল ইবাদত পালন করতে থাকাই আল্লাহর নৈকট্য ও বন্ধুত্বের পথ। আর এভাবে অবিরত নফল ইবাদত করতে করতে মানুষ আল্লাহর মাহবূব বা প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। বান্দার জীবনে এর চেয়ে বড় নিয়ামত ও তৃপ্তি আর কিছুই নেই।

নফল ইবাদত বিভিন্ন প্রকারের। ইলম, নামায, রোযা, দান, তিলাওয়াত, দাওয়াত ইত্যাদি সকল ইবাদতেরই ফরয ও নফল পর্যায় রয়েছে। মুমিন নিজের আগ্রহ ও সাধ্য অনুসারে সহীহ সুন্নাতের আলোকে কিছু নফল ইবাদত বেছে নিয়ে নিজের জন্য দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক একটি নির্ধারিত কর্মসূচি ও কর্মতালিকা অর্থাৎ ওযীফা তৈরি করে নেবেন। সকলের জন্য কুরআন-হাদীস থেকে ওযীফা তৈরি করা সম্ভব হয় না। এজন্য এখানে সহীহ হাদীসের আলোকে সহজে পালনীয় বেশি সাওয়াবের কিছু 'নফল' ইবাদতের ওযীফা প্রদান করা হলো।

(খ) নামাযের ওযীফা

আল্লাহর নৈকট্যলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল 'সালাত' বা নামায। ফরয ইবাদতগুলির মধ্যে যেমন ফরয সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ, নফল ইবাদতের মধ্যেও নফল সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ। সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠ, যিক্‌র ও দু'আ অন্য সময়ের কুরআন পাঠ, যিক্‌র ও দু'আর চেয়ে উত্তম। এজন্য মুমিন সর্বদা বেশি বেশি নফল সালাত আদায়ের চেষ্টা করবেন।

নফল সালাত সাধারণভাবে সবসময় আদায় করা যায়। কিছু সময়ে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। সূর্যোদয়, ঠিক দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় নিষিদ্ধ। এছাড়া ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের দুই

রাক'আত সুন্নাত সালাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত-নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ। আসরের ফরয সালাত আদায়ের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ। অন্যান্য সকল সময়ে মুমিন সুযোগ পেলেই নফল সালাত আদায় করবেন।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সাধারণভাবে যত বেশি পারা যায় নফল সালাত আদায়ের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ "তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।"[৪০]

অন্য এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেনঃ "তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।"[৪১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, কাজেই যার পক্ষে সম্ভব হবে সে যেন যত বেশি পারে সালাত আদায় করে।"[৪২]

সাধারণভাবে নফল সালাত ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বা স্থানে বিশেষ সালাতের বিশেষ মর্যাদা বা ফযীলতের কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের তিন প্রকার সালাতকে দৈনন্দিন ওযীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন:

(১) সালাতুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ

ইশার সালাতের পর থেকে ফজরের সালাতের ওয়াক্ত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু "নফল" বা অতিরিক্ত নামায আদায় করা হবে সবই 'কিয়ামুল্লাইল' বা 'সালাতুল্লাইল' অর্থাৎ "রাতের সালাত" বলে গণ্য হবে। রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে উঠে সালাত আদায় করলে তাকে "তাহাজ্জুদের সালাত" বলা হয়। কেউ যদি ইশার সালাত আদায় করে রাত ৯টা বা ১০টায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং ১১/১২টায় উঠে নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' ও'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি ইশার পরে না ঘুমিয়ে রাত ১১/১২ টার দিকে বা তার পরে কিছু নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' বলে গণ্য হলেও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য নয়।

ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল। প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটু ঘুমিয়ে উঠে 'তাহাজ্জুদ'-রূপে কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে তার সাওয়াব ও

---

[৪০] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫৩।
[৪১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫৩।
[৪২] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ১/৮৪, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৪৯, আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২২৬। হাদীসটি হাসান।

মর্যাদা বেশি। রাতের শেষভাগে তা আদায় করা সর্বোত্তম।

কুরআন কারীমে কোনো সুন্নাত-নফল সালাতের উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের সালাতের কথা বারংবার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে কিছু সময় আল্লাহর যিক্‌রে, তার সাথে মুনাজাতে এবং তাঁরই (আল্লাহর) ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআনে প্রায় ২০ আয়াতে কিয়ামুল্লাইল-তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে।

কিয়ামুল্লাইল বা সালাতুল্লাইলের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এত বেশি নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলি একত্রিত করলে একটি বৃহদাকৃতি পুস্তকে পরিণত হবে। আমর ইবনু আমবাসাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "মহান প্রতিপালক তাঁর বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন রাতের শেষ অংশে। কাজেই তুমি যদি সে সময়ে আল্লাহর যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তবে তা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪৩] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ফরয সালাতের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সালাত রাতের সালাত বা রাতের গভীরে আদায়কৃত সালাত।"[৪৪]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে মানুষেরা তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্য প্রদান কর, আত্মীয়তা রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর, তাহলে তোমরা শান্তিতে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪৫]

আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল্লাইল পালন করবে। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার মানুষদের অভ্যাস, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য, পাপের ক্ষমা, পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ এবং দেহ থেকে রোগব্যধির বিতাড়ন।" হাদীসটি সহীহ।[৪৬]

সাহাবীগণ কিয়ামুল্লাইল পরিত্যাগ পছন্দ করতেন না। আয়েশা (রা) বলেছেন: "কখনো কিয়ামুল্লাইল ত্যাগ করবে না ; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো তা ত্যাগ করতেন না। যদি কখনো অসুস্থ থাকতেন অথবা ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করতেন তবে তিনি বসে তা আদায় করতেন।"[৪৭] অনেক হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো সাহাবী তাহাজ্জুদ পালনে সামান্য অবহেলা করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপত্তি করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত 'বিত্‌র'-সহ মোট এগার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায়

---

[৪৩] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৬৯, নং ৩৫৭৯ (৩৫৭৪), মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৫৩, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/১৮২, জামিউল উসূল ৪/১৪৩-১৪৪।
[৪৪] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২১।
[৪৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৫২।
[৪৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩২৮; সহীহুল জামি ২/৭৫২।
[৪৭] হাদীসটি সহীহ। সুনানু আবী দাউদ ২/৩২, নং ১৩০৭, সহীহুত তারগীব ১/৩৩১।

করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের আগে অনেক সময় কুর'আনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কখনো কিছু তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিক্‌র করার পর তাহাজ্জুদ শুরু করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের সালাতের তিলাওয়াত খুব লম্বা করতেন। এক রাক'আতে অনেক সময় ৪/৫ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রুকু ও সাজদাও অনুরূপভাবে দীর্ঘ করতেন। যতক্ষণ তিনি তিলাওয়াত করতেন প্রায় ততক্ষণ রুকুতে ও সাজদায় থাকতেন। আর তিলাওয়াতের সময় তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ অনুসারে থেমে থেমে দু'আ করতেন। তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে তিনি ক্রন্দন করতেন। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করার কারণে অনেক সময় তাঁর মুবারক পদযুগল ফুলে যেত। আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন গোনাহগার লেখককে ও সকল পাঠককে তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত অনুসারে তাহাজ্জুদ আদায়ের তাওফীক দান করেন; আমীন।

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদ পালনে সচেষ্ট হওয়া। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ে অসুবিধা হলে, প্রথম রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সাধ্যমত ২/৪/৮ রাক'আত সালাত আদায় করে এরপর বিতর আদায় করবেন। এরপর মনের আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে আল্লাহর কাছে সারাদিনের নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, নিজের, বন্ধুদের ও শত্রুদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে, সমস্যাদির জন্য সাহায্য চেয়ে এবং তাঁর সার্বিক রহমত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ঘুমাতে যাবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করেন।

(২) সালাতুদ্দোহা বা চাশত

'দোহা' (الضحى) আরবী শব্দ। বাংলায় সাধারণত 'যোহা' উচ্চারণ করা হয়। এর অর্থ পূর্বাহ্ন বা দিনের প্রথম অংশ (forenoon)। ফারসী ভাষায় একে 'চাশ্‌ত' বলা হয়। সূর্যোদয়ের পর থেকে মধ্যাহ্ন বা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আরবীতে দোহা বা যোহা বলা হয়।

সূর্য পরিপূর্ণ রূপে উদিত হওয়ার পরে, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ২৫ মিনিট পরে দোহা বা চাশ্‌তের সালাতের সময় শুরু। এই সময় থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে এই সালাত আদায় করা যায়। 'দোহা'র সালাত দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত আদায় করা যায়। তাহাজ্জুদ সালাতের পরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন নফল সালাত দোহার সালাত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এই সালাতকে 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'অধিক তাওবাকারীদের সালাত' বা 'আল্লাহওয়ালাগণের সালাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের দেশে এই সালাত 'ইশরাকের সালাত' বা 'সূর্যোদয়ের সালাত' বলে পরিচিত। অনেকে সূর্যোদয়ের পরের সালাতকে 'ইশরাকের সালাত' এবং পরবর্তী সময়ের সালাতকে 'দোহা' বা 'চাশ্‌তের সালাত' বলেন। হাদীস শরীফে 'সালাতুদ দোহা' বা 'দোহার সালাত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে; "ইশরাকের সালাত" শব্দটি

হাদীসে পাওয়া যায় না। সূর্যোদয় থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করলে তা 'সালাতুদ দোহা' বা দোহার সালাত বলে গণ্য হবে।

সালাতুদ্দোহার ফযীলতের অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিক্র করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)" হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৪৮]

এভাবে বসতে না পারলেও দোহার সালাত পৃথকভাবে আদায়ের জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মাঝে মাঝে দোহার (চাশতের) সালাত আদায় করতেন। যে কোনো মুসলিম, ফজরের জামাতের পরে যিক্র করুন বা না করুন, সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বি-প্রহরের মধ্যে দুই/চার রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলেই বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত অশেষ সাওয়াব ও বরকতের আশা করতে পারবেন। এক হাদীসে আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, "আমার প্রিয়তম বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন যেগুলি আমি কখনোই পরিত্যাগ করি না। (১) ঘুমানোর আগে বিত্‌র-এর সালাত আদায় করতে, (২) দুই রাক'আত যোহার বা চাশতের সালাত কখনো পরিত্যাগ না করতে; কারণ তা সালাতুল আওয়াবীন (আল্লাহওয়ালা তওবাকারীগণের সালাত) এবং (৩) প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতে।[৪৯]

আবু হুরাইরা (রা) এবং আবু দারদা (রা) একইভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে উপরের তিনটি কাজের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এবং তিনি জীবনে তা পরিত্যাগ করবেন না।[৫০]

আবু যার (রা) বলেন, নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন, মানুষের দেহের প্রত্যেক জোড়া ও গিটের জন্য (শুকরিয়াস্বরূপ) প্রতিদিন সকালে দান করা তাঁর জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব। ... দুই রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলে এই দানের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে।"[৫১]

(৩) মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী নফল সালাত (আওয়াবীন)

মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে, মাগরিবের পর থেকে ইশা'র সালাত পর্যন্ত যে

---

[৪৮] তিরমিযী ২/৪৮১, নং ৫৮৬, সহীহুত তারগীব ১/২৬০।

[৪৯] সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২৩৭। দেখুন: সহীহ মুসলিম ১/৪৯৯।)

[৫০] সহীহ বুখারী ১/৩৯৫, নং ১১২৪, ২/৬৯৯, নং ১৮৮০, সহীহ মুসলিম ১/৪৯৯, নং ৭২১, ৭২২, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৮।

[৫১] সহীহ মুসলিম ১/৪৯৮, নং ৭২০।

সালাত আদায় করা হয় তা 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত'। আমরা উপরের সহীহ হাদীসগুলিতে দেখেছি যে, চাশতের নামাযকে 'সালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়েছে। অর্থের দিক থেকে দুটি নামকরণের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। 'আওয়াব'গণ বা আল্লাহওয়ালা ও তাওবাকারী আবিদ বান্দাগণ শুধু দোহার (চাশতের) সালাত পড়েন, মাগরিবের পরে সালাত পড়েন না, এরূপ নয়। উভয় সময়েই তাঁরা নফল সালাত আদায় করেন।

হুযাইফা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশা'র সালাত পর্যন্ত নফল সালাতে রত থাকলেন।" হাদীসটি সহীহ।[৫২] আনাস (রা) বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় করতেন।"[৫৩] হাদীসটি সহীহ। হাসান বসরী বলতেন, মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ের সালাতও রাত্রের সালাত বা তাহাজ্জুদের সালাত বলে গণ্য হবে।[৫৪] বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবী তাবেয়ীগণকে এই সময়ে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।[৫৫]

এই সময়ে কত রাক'আত সালাত আদায় করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। মুমিন নিজের সুবিধা ও সাধ্যমতো এই সময়ে নফল সালাত আদায় করবেন। একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো বাজে কথা বলার আগে ৬ রাক'আত সালাত আদায় করবে সে ১২ বৎসর ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে।[৫৬]

এছাড়া নিম্নের নফল সালাতগুলি যথাসম্ভব পালনের চেষ্টা করবেনঃ

(৪) তাহিয়্যাতুল ওযূ

দিনে বা রাতে যে কোনো সময়ে ওযু করার পরেই দু রাক'আত সালাত আদায় করার অতুলনীয় ফযীলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(৫) তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ব দুখূলুল মাসজিদ

মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে যে সালাত আদায় করা হয় তা তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা মসজিদের সালাম নামে পরিচিত। মসজিদের পাওনা যে, মমিন মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে অন্তত কিছু সালাত আদায় করবে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন যে, মসজিদে প্রবেশ

---

[৫২] ইবনু আবী শাইবা, মুসান্নাফ ২/১৫, নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ১/৫১, ৫/৮০, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩।
[৫৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/৩৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩।
[৫৪] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/১৯,সুনানু আবী দাউদ ২/৩৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৩০, ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/১৫, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩।
[৫৫] মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা ২/১৪-১৬।
[৫৬] তিরমিযী ২/২৯৮, নং ৪৩৫। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ।

করলে অন্তত দু রাক'আত সালাত আদায় না করে কখনোই বসবে না। মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগেই সুন্নাত সালাত আদায় করলে বা জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেও এতে 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' আদায় হবে। না হলে- মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে- অন্তত দু রাক'আত নফল সালাত আদায় করে বসতে হবে।

(৬) সালাতুত তাসবীহ

যিক্‌রের মূল চারটি বাক্য: তাসবীহ 'সুবহানাল্লাহ' , তাহমীদ 'আল-হামদু লিল্লাহ' , তাহলীল 'লা- ইলাহা ইল্লল্লাহ' এবং তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' সহকারে সালাত আদায় করাকে সালাতুত তাসবীহ বলে। চার রাক'আত সালাতে প্রতি রাক'আতে ৭৫ বার করে চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার উক্ত যিক্‌রগুলি আদায় করতে হবে। সহীহ হাদীসে সালাতুত তাসবীহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

(৭) সালাতুত তাওবা

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোনো বান্দা যদি কোনো গোনাহের কর্ম করে সাথে সাথে সুন্দর করে ওযু করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।"[৫৭]

(৮). সালাতুল ইসতিখারা

বিপদে বা সমস্যায় নামায পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া মুমিনের দায়িত্ব। আল্লাহ বলেছেন: ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল, কোনো বিপদ, দুশ্চিন্তা বা সমস্যা দেখা দিলে তিনি সালাত আদায় করতেন। এজন্য বিপদে আপদে অধৈর্য না হয়ে সাধ্যমত নফল সালাত আদায় করবেন। এছাড়া কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে 'সালাতুল ইসতিখারা' আদায় করবেন। এ সকল সালাত বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা 'রাহে বেলায়াত' পুস্তকে দেখুন।

(খ) রোযার ওযীফা

সিয়াম বা রোযা মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত। ফরয সিয়ামের পাশাপাশি বেশি বেশি নফল সিয়াম পালন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের অন্যতম রীতি ছিল। তাঁরা নফল সিয়াম পালনের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা নিয়মিত ও অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন। প্রতি দুইদিন পর একদিন, বা একদিন পর একদিন, বা প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এছাড়া সুযোগমতো যত বেশি সম্ভব অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি।

তাযকিয়া, বেলায়াত ও ইহসানের পথে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

[৫৭] সুনানুত তিরমিযী ২/২৫৭, নং ৪০৬, ৫/২২৮, নং ৩০০৬, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ২/৩৯০, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২১৬, সহীহু সুনানি আবী দাউদ ১/২৮৩।

বৎসরের ৫টি দিন ছাড়া অন্য যে কোনো সময়ে নফল সিয়াম পালন করা যায়। প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 'আইয়াম বীযের' নফল সিয়াম পালনকে নিয়মিত ওযীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন। এছাড়া আশূরার রোযা ও আরাফাতের দিবসের রোযা পালন করবেন। এ সকল দিবসে সিয়াম পালনের অকল্পনীয় সাওয়াবের কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এরপর সুযোগমত বেশি বেশি নফল রোযা পালনের চেষ্টা করবেন।

(গ) ইলমের ওযীফা

ইলম অর্জন করা একটি পৃথক ইবাদত। নিজের ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ করার মত ইলম অর্জন করা ফরয। এরপর ইলম অর্জন করা 'নফল' ইবাদত হিসেবে সর্বোত্তম ইবাদত। অন্য নেক আমল বেশি করার চেয়ে ইলম বেশি করে শিক্ষা করার সাওয়াব বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "ইবাদতের মর্যাদার চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিকতর বা অতিরিক্ত ইবাদতের চেয়ে অতিরিক্ত ইলম উত্তম।[৫৮]

ইলমের মর্যাদার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, এই মহান মর্যাদা বোধহয় শুধু মাদ্রাসায় যারা পড়েন অথবা যারা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ইলম শিক্ষা করেন তাদের জন্যই। প্রকৃত বিষয় তা নয়। যে কোনো বয়সের যে কোনো মুমিন ওয়ায মাহফিলে, মসজিদে, শুক্রবারে খুতবার আলোচনায়, আলেমের নিকট প্রশ্ন করার মাধ্যমে, বই পড়ে বা যে কোনো ভাবে ইলম শিক্ষা করলেই এই মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই অভিশপ্ত, ব্যতিক্রম হলো, আল্লাহর যিক্‌র এবং যিকর সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে এবং আলিম এবং শিক্ষার্থী বা ইলম অর্জনে রত ব্যক্তি। হাদীসটি হাসান।[৫৯]

কিছু সময় ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকা অনুরূপ সময় যিক্‌র বা অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত থাকার মতই সাওয়াবের কাজ। উপরন্তু আমরা দুনিয়াতে যত নেক আমল করি সেগুলির সাথে ইলম শিক্ষার নেক আমলের দুইটি বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথমত, অন্যকে শিখালে ইলম-এর সাওয়াব চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয়ত, ইলমের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যদি কেউ কোনো ইলম শিক্ষা দেয়, তবে সেই শিক্ষা অনুসারে যত মানুষ কর্ম করবে সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করবে, কিন্তু এতে তাদের সাওয়াবের কোনো ঘাটতি হবে না।" হাদীসটি হাসান।[৬০]

ইলম শিক্ষার জন্য নিয়মিত ওযীফা তৈরি করতে হবে। ইলমের মূল উৎস

[৫৮] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/১৭১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২০। হাদীসটি হাসান।
[৫৯] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৬১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১০৬।
[৬০] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১০৮।

কুরআন ও হাদীস। কুরআন কারীমের কিছু অংশ নিয়মিত বুঝে অনুবাদ বা তাফসীর দেখে পড়বেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অনুবাদ, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, বাইয়ানুল কুরআন ইত্যাদি তাফসীর পড়ুন। এছাড়া নিয়মিত অন্তত ২/১ টি হাদীস পাঠ করবেন। সাধারণ যাকিরদের জন্য 'রিয়াদুস সালিহীন' পুস্তকটি খুবই উপকারী। এই পুস্তকটির অনুবাদ নিয়মিত পাঠ করবেন। কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য আলিমদের লেখা ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ ওযীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক আলোচনা করেন এবং ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনী পরিহার করেন এরূপ হক্কানী আলিমদের ওয়ায-নসীহত ও আলোচনায় সুযোগমত উপস্থিত হবেন।

ইলম শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিজের জীবনে তা পালন করা। কখনোই কিছু শিখে তা নিয়ে বিতর্ক করবেন না। প্রয়োজনে কাউকে কিছু শেখাতে পারেন। তবে কোনোরূপ তর্ক বা ঝগড়া উত্থাপিত হলে তা পরিহার করবেন। এ বিষয়ে আলিমদের সাথে কথা বলার জন্য সকলকে উৎসাহিত করবেন।

(ঘ) দাওয়াতের ওযীফা

নিজের জীবনের ইসলাম প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো 'আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার', অর্থাৎ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা', ইকামতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা করা বা 'আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ' বা 'আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। এই দায়িত্ব কখনো ফরয এবং কখনো নফল। তবে এর ফযীলত ও সাওয়াব অপরিসীম। কুরআন-হাদীসে বারংবার এই দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

মুমিন নিয়মিত ওযীফা করে নিবেন প্রতিদিন কিছু মানুষকে ভাল কাজের জন্য ডাকার। এ ছাড়া সুযোগ পেলেই মানুষকে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে ভাল কাজের উৎসাহ দিবেন এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবেন।

ভাই, চলেন, জামাতে নামায আদায় করে আসি। ভাই, ধূমপান বাদ দেওয়া যায় না। ... এরূপ একটি বাক্যের সাওয়াব অপরিসীম। কেউ মানুক অথবা না মানুক, কাউকে ভাল কাজের উৎসাহ দিয়ে বা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে একটি শব্দ বলা একটি বড় দানের সমতূল্য। আর যদি ঐ ব্যক্তি উক্ত কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাল কাজ করেন বা খারাপ কাজ ত্যাগ করেন তবে 'দাওয়াত'-কারী ব্যক্তি বা মুবাল্লিগ অপরিমেয় সাওয়াব লাভ করবেন।

(ঙ) খেদমতে খালকের ওযীফা

আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত

পথ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবমূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে রত থাকবেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার নিকট মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন।"[৬১] ... এই অর্থে অনেক হাদীস আমরা হাদীসের গ্রন্থসমূহে দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি কেউ কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায় তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে জান্নাতের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে।"[৬২] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "যদি কেউ সকালে কোনো অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যায় যায় তবে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।"[৬৩]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বলেন : "তোমাদের মধ্যে আজ কে সিয়ামরত ছিলে? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো জানাযায় শরীক হয়েছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করেছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করেন: আজ তোমাদের কে অসুস্থ কোনো মানুষকে দেখতে গিয়েছ? আবু বকর বলেন: আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এই কর্মগুলি যদি কোনো মানুষের মধ্যে একত্রিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি অবশই জান্নাতী হবেন।"[৬৪] মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই কর্মগুলি একত্রে করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[৬১] মুনযিরী, আত-তাগীব ৩/৩৪৬-৩৫১, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১, সহীল জামিয়িস সাগীব ১/৯৭।
[৬২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৮৯।
[৬৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩০০। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।
[৬৪] সহীহ মুসলিম ২/৭১৩, নং ১০২৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যিক্‌রের ওযীফা

যিক্‌রের পরিচয় ও গুরুত্ব

যিক্‌র আরবী শব্দ। বাংলায় এর অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। যে কোনো প্রকারে মনে, মুখে, অন্তরে, কর্মের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালন করে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিক্‌র বা আল্লাহর যিক্‌র বলা হয়। ব্যাপক অর্থে ঈমান ও নেককর্ম সবই 'যিক্‌র' বলে গণ্য। এ অর্থে বেলায়াতের পথের আট পর্যায়ের সকল কর্মকেই এক কথায় 'যিক্‌র' বলে অভিহিত করা যায়।

বিশেষভাবে মুখে বারংবার আল্লাহর নাম, গুণাবলি ইত্যাদি পাঠ বা জপ করা কুরআন-হাদীস নির্দেশিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর তাকবীর, তাহ্‌লীল, প্রশংসা, গুণগান, দু'আ, মুনাজাত, ইসতিগফার, দরুদ, সালাম ইত্যাদি সবই এই পর্যায়ের যিক্‌র। মুমিন বসে, শুয়ে, হাটতে, চলতে ওযু-সহ বা ওযূ ছাড়া সর্বাবস্থায় এ সকল যিকর পালন করতে পারেন, যদিও পাক-পবিত্র হয়ে আদব সহ বসে যিক্‌র করা উত্তম।

আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথের কর্ম দুই পর্যায়েরঃ ফরয ও নফল। নফল পর্যায়ের যিক্‌রকে বেলায়াতের পথে অন্য সকল নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হাদীস শরীফে। সর্বোপরি, আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআন-হাদীসে যিক্‌রের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) বলেন : একব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকব। তিনি বলেন : তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকে।"[৬৫]

এখানে আমরা দেখছি যে, নফল ইবাদত বহুমুখি ও অনেক। অন্যান্য নফল ইবাদত না করতে পারলেও সর্বক্ষণ জিহ্বাকে আল্লাহর যিকরে রত রাখা অতীব প্রয়োজন।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোন্‌টি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত বরণ করার থেকেও উত্তম কর্ম কী তা-কি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেন : 'আল্লাহর যিক্‌র।' মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন : আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিক্‌রের

---

[৬৫] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, নং ৩৩৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩, মুসতাদরাক হাকেম ১/৪৯৫, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১২।

চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৬৬]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করার। আর আল্লাহর যিক্‌রের উদাহরণ এমন যে, এক ব্যক্তিকে শত্রুগণ ধাওয়া করে তার পিছে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় লোকটি একটি সুসংরক্ষিত দুর্গে এসে পৌছাল এবং সে দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পায় না।" হাদীসটি সহীহ।[৬৭]

প্রথমতঃ সার্বক্ষণিক বা বেশিবেশি পালনীয় যিক্‌র-ওযীফা

সকল সময়ে কর্মব্যস্ত্যতার মধ্যে বা কোনোরূপ অবসর পেলে নিম্নের যিক্‌রগুলি বেশিবেশি জপ বা পাঠ করবেন। যাকির মনের আবেগ ও আগ্রহ অনুসারে এগুলির মধ্য থেকে যে কোনো এক বা একাধিক যিক্‌র বেছে নিতে পারেন।

(১) যিক্‌র নং ১: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)।

এটি এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম যিক্‌র। এই যিক্‌রটি সর্বদা বেশি বেশি করে জপ করতে বিভিন্ন হাদীসে দীসে বলা হয়েছে। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "সর্বোত্তম যিক্‌র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ আলহামদুলিল্লাহ।" হাদীসটি সহীহ।[৬৮]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ "তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।" তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়িত করবো?" তিনি বললেনঃ "তোমরা বেশি বেশি করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" হাদীসটির সনদ হাসান অর্থাৎ সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য।[৬৯]

(২) যিক্‌র নং ২: سُبْحَانَ اللهِ

উচ্চারণ : 'সুব'হা-নাল্লা-হ', **অর্থ** : আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

(৩) যিক্‌র নং ৩: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

উচ্চারণ : আল 'হামদু লিল্লাহ। **অর্থ** : "প্রশংসা আল্লহর জন্য।"

(৪) যিক্‌র নং ৪: اَللهُ أَكْبَرُ

---

[৬৬] মুসনাদ আহমদ ৬/৪৪৬, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, ৭৪, তিরমিযী ৫/৪৫৯, ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৩

[৬৭] সহীহ ইবনু খুযাইমা ৩/১৯৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৮২, আত-তারগীব ২/৩৭০-৩৭১।

[৬৮] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬২, নং ৩৩৮৩, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২৬, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩২৬-৩২৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৬, ৬৮১।

[৬৯] মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৮৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৫২, ২/২১১, ১০/৮২, আত-তারগীব ২/৩৯৪।

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার। **অর্থ** : "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

উপরের যিক্‌র চারটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য। এগুলি পাঠ ও জপ করার সাওয়াব ও বরকত অপরীমেয়। দুই ভাবে এই যিক্‌রগুলি পালন করতে হয়: (১) গণনাবিহীনভাবে সদা সর্বদা জপ করে এবং (২) নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করে। মুমিন সর্বদা এই বাক্যগুলি জপ করার চেষ্টা করবেন। সর্বদা না পারলে সুযোগমত বেশি বেশি জপ করবেন। এগুলির ফযীলতে অনেক সহীহ ও হাসান হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে সামুরা ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'। তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার। (বাক্যগুলির সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা ফযীলত নেই।)"[৭০]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আমি 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতে এত বেশি পছন্দ করি যে, এগুলি বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে যা কিছু আসে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়।"[৭১]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহে যাবে বা তা অতিক্রম করবে তখন তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেন: মসজিদসমূহ। আমি বললাম: বিচরণ ও ভক্ষণ কি? তিনি বললেন: 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'।" হাদীসটি হাসান।[৭২]

ইবনু মাস'উদ (রা), সালমান ফারিসী (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এই বাক্য চারিটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।[৭৩] আবু যার (রা) ও আয়েশা (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিক্‌র করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য।"[৭৪] আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এই বাক্যগুলি কিয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।"[৭৫] আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এই বাক্যগুলিই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল।"[৭৬]

---

[৭০] সহীহ মুসলিম ৩/১৬৮৫, নং ২১৩৭।
[৭১] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৫।
[৭২] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৩২, নং ৩৫০৯, আত-তারগীব ২/৪২২, নং ২৩২৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯১।
[৭৩] ইমাম মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪০৭-৪০৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৮-৯০।
[৭৪] সহীহ মুসলিম ১/৪৯৮, নং ৭২০, ২/৬৯৭, নং ১০০৬।
[৭৫] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৫০, মুসনাদ আহমদ ৩/৪৪৩, ৪/২৩৭, ৫/৩৬৫, তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ২২/৩৪৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৯, ১০/৮৮।
[৭৬] মুসতাদরাক হাকিম ১/৭২৫, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৯, আত-

আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিক্রগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।"[৭৭] আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) উভয়ে নবীয়ে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন : "আল্লাহ্ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ্ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিক্র করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।"[৭৮] আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এই চারিটি বাক্য যিক্রকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন।"[৭৯]

সাহাবীগণও এ সকল বাক্য বেশি বেশি করে যিক্র করতে উৎসাহ্ প্রদান করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন: "সুব'হা-নাল্লাহ্, আল-'হামদু লিল্লাহ্, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার – বলা আমার নিকট আল্লাহ্র রাস্তায় সমসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয়।"[৮০]

তিনি আরো বলেন : "যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি অনুভব করে, সে যেন বেশি বেশি করে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু', 'আল্লাহু আকবার', 'আল-'হামদু লিল্লাহ' ও 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলতে থাকে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৮১]

(৫) যিক্র নং ৫: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ : লা- 'হাওলা ওয়া লা- কূওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।"

এই বাক্যের বেশি বেশি যিক্র বা জপ করার নির্দেশে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমরা বেশি বেশি বেশি করে 'চিরস্থায়ী নেককর্মগুলি' কর। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : এগুলি কি? তিনি বললেন: তাকবীর (আল্লাহু আকবারখ), তাহলীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু), তাসবীহ (সুব'হা-নাল্লাহ), তাহমীদ (আল-'হামদু লিল্লাহ) এবং 'লা- হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৮২] আবু মুসা (রা),

---

তারগীব ২/৪১৬।

[৭৭] মুসনাদু আহমদ ৩/১৫২, আত-তারগীব ২/৪১৮।

[৭৮] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১০, মুসনাদ আহমদ ২/৩১০, ৩/৩৫, ৩৭, মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা ৬/১০৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১০৪, আত-তারগীব ২/৪১০, নং ২২৯৯।

[৭৯] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৬/৩০৯, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৩৮৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯১, আত-তারগীব ২/৪২১।

[৮০] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা ৬/৯২, ৭/১৭৬, ১৭৭, বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ১/৪৪৭, ৪৪৮।

[৮১] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৯/২০৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯০, আত-তারগীব ২/৪২০-৪২১।

[৮২] মুসনাদ আহমদ ৩/৭৫, ৪/২৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৪, ৭২৫,

আবু হুরাইরা (রা), আবু যার (রা), মু'আয ইবনু জাবাল (রা), সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত অনেকগুলি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্ডারগুলির মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা।[৮৩]

আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে ইবরাহীম (আ) আমাকে বলেন : আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করে ...। জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৮৪] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।" হাদীসটি হাসান।[৮৫]

(৬) যিক্র নং ৬: সর্বদা পালনীয় ইসতিগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ [أَنْتَ] التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণ: রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফূর।

অর্থ: "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।"

সদা-সর্বদা ও বেশি বেশি ইসতিগফার করতে বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে কুরআন ও হাদীসে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা বা ইস্তিগফার করি।"[৮৬]

ইসতিগফারের মাসনূন বাক্যগুলির অন্যতম উপরের বাক্যটি। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক মাজলিসেই (একবারের যে কোনো বৈঠকের মধ্যে) মাজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার এই বাক্যটি (রাব্বিগ্ ফিরলী ... গাফূর) বলতেন।[৮৭]

---

[৮৩] মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২৪৭, ৭/১৬৬, ১০/৮৬, ৮৭, ৮৯, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৩৭-৩৩৯। সহীহ বুখারী ৪/১৫৪১, ৫/২৩৪৬, ৫/২৩৫৪, ৬/২৪৩৭, ২৬৯০, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৮, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৩২-৪৩৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭-৯৯।

[৮৪] মুসনাদ আহমদ ৫/৪১৮, আত-তারগীব ২/৪৩৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭।

[৮৫] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫০৯, নং ৩৪৬০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৮২, তারগীব ২/৪১৮, নং ২৩১৪।

[৮৬] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৫, নং ২৭০২।

[৮৭] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৯৪, নং ৩৪৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/২০৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১১৯। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(৭) যিক্‌র নং ৭: (মাসনুন ইসতিগফার)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (الْعَظِيْمَ) الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ (‘আযীমাল্) লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা-হুআল ‘হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : “আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।”

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যদি কেউ এই কথাগুলি তিন বার বলে, তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন পাপও করে থাকে।” হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।[৮৮]

(৮) যিক্‌র নং ৮ : সদা সর্বদা পালনের বিশেষ দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ [وَعَافِنِيْ] وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী, ওয়ার'হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়া ‘আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী।

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।”

সাহাবী আবু মালিক আশ'আরী (রা) তাঁর পিতা সাহাবী আসিম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উপরের বাক্যগুলি দিয়ে বেশি বেশি দু'আ করতে শেখাতেন।[৮৯]

এই দু'আর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুই চাওয়া হয়েছে। মুমিনের উচিত সকল ব্যস্ততার মধ্যে এই মুনাজাতটি বলতে থাকা।

দ্বিতীয়ত: সময় নির্ধারিত যিক্‌র-ওযীফা

(ক) ফজরের ওযীফা

পুরুষের জন্য ওজর ছাড়া জামাত পরিত্যাগ করা কঠিন গোনাহের কাজ। ফজরের সালাত জামাতে আদায় করে সম্ভব হলে সালাতের স্থানেই বসে নিম্নের যিক্‌রগুলি আদায় করবেন। মাগরিবের পরেও এই অযীফাগুলি এভাবেই আদায় করবেন।

(১) যিক্‌র নং ৯ (৩ বার) : أَسْتَغْفِرُ اللهَ

---

[৮৮] মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯২, ২/১২৮, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭।
[৮৯] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৩, নং ২৬৯৭।

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হ। **অর্থ** : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(২). যিক্‌র নং ১০ (১ বার)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী, আপনি বরকতময়।"

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে তিন বার ইস্তিগফার বলে এরপর "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... " বলতেন।[৯০] এ বিষয়ে আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(৩) যিক্‌র নং ১১ (৭ বার)

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

হারিস ইবনু মুসলিম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের সালাতের পরেই (দুনিয়াবী) কথা বলার আগে এই দু'আ ৭ বার বলবে। যদি তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। অনুরূপভাবে, মাগরিবের সালাতের পরে কথা বলার আগেই এই দু'আ ৭ বার বলবে। তুমি যদি ঐ রাত্রে মৃত্যু বরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।" অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[৯১]

(৪). যিক্‌র নং ১২ (১ বার)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারন : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল

---

[৯০] সহীহ মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯১।

[৯১] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৩৩, সুনানু আবু দাউদ ৪/৩২০, নং ৫০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৬৭, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৬১-৩৬৫, নাবাবী, আযকার, পৃ. ১১৫, যাকারিয়্যা, আল-ইখবার, পৃ: ৬৫।

মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লা-হুম্মা, লা-মা-নি'আ লিমা- আ'অ্‌ত্বাইতা, ওয়ালা- মু'অ্‌ত্বিয়া লিমা- মানা'অ্‌তা, ওয়ালা-ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নেই। আর আপনি যা না দেন তা দেওয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার বাইরে কোনো উপকারে লাগে না।"

মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরেই এই যিক্‌রটি বলতেন।"[৯২]

(৫) যিক্‌র নং ১৩: আয়াতুল কুরসী (১ বার):

আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে তাঁর জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।"[৯৩] অন্য হাদীসে হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ফরয সালাতের শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে পরবর্তী সালাত পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকবে।"[৯৪] উবাই ইবনু কা'ব (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বিন থেকে হেফাযতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত জ্বিন থেকে হেফাযতে থাকবে। হাদীসটি সহীহ।[৯৫]

(৬). যিক্‌র নং ১৪: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার:

উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক সালাতের পরে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে। দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক সালাতের পরে মু'আওয়িযাত, (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৯৬]

অন্য হাদীসে এই তিনটি সূরা তিন বার করে সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তুমি যদি

---

[৯২] সহীহ বুখারী ১/২৮৯, নং ৮০৮, ৫/২৩৩২, নং ৫৯৭১, সহীহ মুসলিম ১/৪১৪-৪১৫, নং ৫৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৪৫-৩৪৮, ৫/৩৪৯।

[৯৩] হাদীসটি হাসান। নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৩০, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৪৮, ১০/১০২, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৪৮।

[৯৪] হাদীসটি হাসান। তাবারানী, কাবীর ৩/৮৩। হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৪৮, ১০/১০২, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৪৮।

[৯৫] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১/২০১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৪৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৭, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫।

[৯৬] হাদীসটি হাসান। সুনানু আবী দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২৩।, সুনানুত তিরমিযী ৫/১৭১, নং ২৯০৩, সহীহুত তিরমিযী ২/৮, ফাতহুল বারী ৯/৬২। সুনানুন নাসাঈ ৩/৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৪৪, নং ২০০৪।

সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ কর তবে তোমার আর কিছুরই দরকার হবে না।" হাদীসটি সহীহ।[৯৭]

এ জন্য যাকির ফজর ও মাগরিবের পরে সূরাগুলি তিনবার করে পাঠ করবেন। আর যোহর, আসর ও ইশার পরে একবার করে পাঠ করবেন।

(৭). যিক্র নং ১৫: (১০০ বা ৪০০ তাসবীহ)

৩৩ "সুব'হানাল্লাহ", ৩৩ "আল্'হামদুলিল্লাহ" এবং ৩৪ "আল্লাহু আকবার"।

এই যিক্রগুলির বিষয়ে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বলা হয়েছে। উপরের সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪০০ বার; ১০০ বার "সুবহানাল্লাহ", ১০০ বার "আলহামদুলিল্লাহ", ১০০ বার "আল্লাহু আকবার" এবং ১০০ বার "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। সর্বনিম্ন সংখ্যা ৩০ বার; ১০ বার "সুবহানাল্লাহ", ১০ বার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং ১০ বার "আল্লাহু আকবার"।

যাকির প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে অন্তত ৩৩+৩৩+৩৪=১০০ বার এগুলি পাঠ করবেন। আর বিশেষ করে ফজরের এবং আসরের পরে প্রত্যেক বাক্য ১০০ বার করে মোট ৪০০ বার এগুলি পাঠ করবেন।

উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব। তিনি বলেন: "তুমি ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলবে, তাহলে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল হামদু লিল্লাহ' বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তাহলে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। তুমি ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে, তাহলে তোমার সাওয়াবে আসমান ও জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে (এবং তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না) হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলি হাসান।[৯৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে সে যেন একশতটি হজ্ব আদায় করল বা একশতটি উট আল্লাহর ওয়াস্তে দান করল। যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ১০০ টি ঘোড়ার পিঠে মুজাহিদ প্রেরণ করলো, অথবা আল্লাহর রাস্তায় ১০০ টি অভিযানে শরীক হলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'লা-

---

[৯৭] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৬৭, নং ৩৫৭৫, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২১, নং ৫০৮২, সাহীহুত তারগীব ১/৩৩৯।

[৯৮] মুসনাদ আহমদ ৬/৩৪৪, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫২, নং ৩৮১০, নাসাঈ, আসসুনানুল কুবরা ৬/২১১, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২৪/৪১০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯২।

ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো, সে যেন ইসমাঈল বংশের একশত ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলো। আর যে ব্যক্তি এই দুই সময়ে ১০০ বার করে 'আল্লাহু আকবার' বলল, ঐ দিনে তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি কেউ তার সমান এই যিক্‌রগুলি পাঠ করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাহলে সেই শুধু তার উপরে উঠতে পারবে।)

ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র পরিবর্তে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' ১০০ বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৯]

(৮) যিক্‌র নং ১৬: সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (১ বার)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্বতানী, ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়াওয়া'অ্দিকা মাস তাতা'অ্তু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবি। ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।"

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এই দু'আটি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু'আ, যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি এই দু'আর অর্থে সুদৃঢ়

---

[৯৯] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫১৩, নং ৩৪৭১, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২০৫, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৩।

একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে (সন্ধ্যায়) তা পাঠ করবে, সে যদি ঐ রাতেই সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে।"[১০০]

এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এই দু'আর ক্ষেত্রে ও মাসনূন সকল দু'আর ক্ষেত্রে দু'আর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং দু'আ পাঠের সময় অর্থের দিকে মনোযোগ দিয়ে, হৃদয়কে অর্থের সাথে সাথে আলোড়িত করে দু'আ পাঠ করলেই আমরা এ সকল দু'আর পূর্ণ ফযীলত লাভ করতে পারব। আর যদি অর্থ না বুঝি, বা অর্থ বুঝা সত্ত্বেও অর্থের দিকে মনোযোগ না দিয়ে অভ্যাসমতো মুখস্থ পড়ে যাই, তাহলে আমরা এ সকল দু'আর ফযীলত ও উপকার পুরোপুরি লাভ করতে পারব না।

(৯). যিক্‌র নং ১৭: ১০০ বার

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থ : "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (বা প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি।"

আবু তালহা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যদি কেউ ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লহি ওয়া বি'হামদিহী' বলে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চব্বিশ হাজার) সাওয়াব লিখবেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমাদের কেউই বিপদে পড়বে না (জাহান্নামে কাউকেই যেতে হবে না।) তিনি বলেন : হাঁ। তোমাদের অনেকেই এত বেশি সাওয়াব নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে যে, পাহাড়ের উপরে দিলেও পাহাড় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা এসে সব সাওয়াব নিয়ে চলে যাবে। এরপর মহাপ্রভু রহমত নিয়ে এগিয়ে আসবেন।" হাদীসটি সহীহ।[১০১]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলে, তাহলে তার চেয়ে বেশি না বলে কেউ তার চেয়ে বেশি আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে পারবে না।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, "ঐ ব্যক্তি গোনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়, তাহলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।" কোনো কোনো বর্ণনায় যিক্‌রের শব্দটি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'-র পরিবর্তে 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি সহীহ।[১০২]

---

[১০০] সহীহ বুখারী ৫/২৩২৩, নং ৫৯৪৭। জামিউল উসূল ৬/২৫৮।

[১০১] মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৭৯।

[১০২] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪১, সুনানুত তিরমিযী ৫/৫১১, নং ৩৪৬৬, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৪, নং ৫০৯১, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫৩, নং ৩৮১২, সহীহুত তারগীব ১/৩৪০-৩৪১।

(১০). যিক্‌র নং ১৮ : (তিন বার)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়াবি'হামদিহী, 'আদাদা খাল্‌ক্বিহী, ওয়ারিদ্বা-নাফ্‌সিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী।

অর্থ: "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টির সম সংখ্যক, তার নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাক্যের কালির সমপরিমাণ।"

উম্মুল মুমিনীন জুআইরিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের পরে তাঁকে তাঁর সালাতের স্থানে যিক্‌র রত অবস্থায় দেখে বেরিয়ে যান। এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও ঐ অবস্থায় তাসবিহ তাহ্‌লীলে রত রয়েছেন। তিনি বলেন : "তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এই পর্যন্ত এভাবেই যিক্‌রে রত রয়েছ ?" তিনি বললেন: " হাঁ।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (উপরের বাক্যগুলি)। তুমি সকাল থেকে এই পর্যন্ত যত কিছু বলেছ সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এই বাক্যগুলির সাওয়াব সেই একই পরিমাণ হবে।"[১০৩]

ইমাম তিরমিযী অনুরূপ ঘটনা উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। সাফিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে দেখেন আমার সামনে চার হাজার বিচি রয়েছে যা দিয়ে আমি তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহর যিক্‌র করছি। তিনি বললেন : তুমি কি এতগুলির সব তাসবীহ পাঠ করেছ? আমি বললাম: " হাঁ।" তখন তিনি তাকে উপরের যিক্‌রের অনুরূপ বাক্য শিখিয়ে দেন।[১০৪]

(১১). যিক্‌র নং ১৯: দরুদ শরীফ ১০ বার

উম্মু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভ করবে। হাদীসটি সহীহ।"[১০৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যে সকল দরুদ পাঠ করতেন বা শিখিয়েছেন সে সকল মাসনূন দরুদ সম্পর্কে এহইয়াউস সুনান ও রাহে বেলায়াত গ্রন্থদ্বয়ে বিস্ত ারিত আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক শেখানো সর্বোত্তম দরুদ **'দরুদে**

---

[১০৩] সহীহ মুসলিম ৪/২০৯০-২০৯১, নং ২৭২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১১০, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ১/৪০২, ৬/৪৮, ৪৯।

[১০৪] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৫৫, নং ৩৫৫৪। ইমাম তিরমিযী যদিও এই বর্ণনাটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তবে ইমাম হাকিম ও যাহাবী সাফিয়্যার হাদীসের সনদ আলোচনা করে তা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৩২।

[১০৫] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২০, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫, যাকারিয়্যা, আল-ইখবার, পৃ: ১৫৪।

ইবরাহীমী'। তবে যে কোনো শব্দে সালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন, –

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَآلِهِ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্ম সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ : "হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর ও তাঁর বংশধর-অনুসারীদের উপর এবং আপনি সালামও প্রেরণ করুন।"

(১২). যিক্‌র নং ২০ : (হেফাযতের দু'আ: ৩ বার)

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ •

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল লাযী লা- ইয়াদুর্‌রু মা'আ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা- ফিস সামা-ই, ওয়া হুআস সামীউল 'আলীম।

অর্থ : "আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি), যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।"

উসমান (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো বান্দা সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এই দু'আটি পাঠ করে তবে ঐ দিনে ও ঐ রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" হাদীসটি সহীহ।[১০৬]

(১৩). যিক্‌র নং ২১: (দুশ্চিন্তা-মুক্তির দু'আ: ৭ বার)

حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লা-হু, লা- ইলাহা ইল্লা- হুআ, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুআ রাব্বুল 'আরশিল আযীম।

অর্থ: "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, তিনি মহান আরশের প্রভু।"

উম্মু দারদা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার এই আয়াতটি পাঠ করবে আল্লাহ তাঁর সকল চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[১০৭]

(১৪). যিক্‌র নং ২২ : (আনন্দলাভের দু'আ: ৩ বার)

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

---

[১০৬] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৮, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৩, নং ৫০৮৮, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৭৩, নং ৩৮৬৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৫, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৭২-৩৭৭।

[১০৭] সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২১, নং ৫০৮১, তারগীব ১/২৫৫, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ১২৭-১২৮, হিসনুল মুসলিম, পৃ. ৬১।

উচ্চারণ: রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থ: "আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ও খুশি হয়েছি।"

মুনাইযির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে এই বাক্যগুলি বলবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, তাঁর হাত ধরে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।" হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।[১০৮]

অন্য হাদীসে আবু সাল্লাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (বা সকালে ও বিকালে) এই বাক্যগুলি (৩ বার) বলে, তবে আল্লাহর উপর হক্ক (নিশ্চিত) হয়ে যায় যে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও খুশি করবেন।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১০৯]

একটি সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি (রাদীতু বিল্লাহি ...) বলবে তাঁর জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যাবে।" এই হাদীসে এই বাক্যগুলি বলার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সর্বদা বা যে কোনো সময় আমরা এই দু'আ পাঠ করতে পারব। যাকিরের উচিত সকালে ও সন্ধ্যায় ৩ বার এবং অন্যান্য সময়ে সুযোগমত এই বাক্যগুলি বলা।[১১০]

(১৫). যিক্‌র নং ২৩: (আল্লাহর সাহায্যলাভের দু'আ: ১বার)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণ : ইয়া- হাইউ ইয়া কাইউমু, বিরাহমাতিকা আসতাগীসু, আসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহু, ওয়া লা- তাকিলনী ইলা- নাফসী তারফাতা 'আইন।

অর্থ: "হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক ও অমুখাপেক্ষী তত্ত্বাবধায়ক, আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রাণ প্রর্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না (সর্বদা আপনার তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখুন)।"

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা (রা)-কে বলেন, "আমি তোমাকে যে ওসীয়ত করছি তা গ্রহণ করতে তোমার অসুবিধা কি? আমি ওসীয়ত করছি যে, তুমি

---

[১০৮] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৬, যাকারিয়্যা, আল-ইখবার ফীমা লা ইয়াসিহ্হু, পৃ: ১৫১।

[১০৯] মুসনাদু আহমদ ৪/৩৩৭, সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৯, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৭৩, নং ৩৮৭০, বুসীরী, যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ, পৃ. ৪৯৯, আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনু মাজাহ, পৃ. ৩১৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৬।

[১১০] সহীহ মুসলিম ৩/১৫০১, নং ১৮৮৪, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৭, নং ১৫২৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৯, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৯৮-৪০০।

সকালে ও সন্ধ্যায় এই কথা বলবে।" হাদীসটি সহীহ।[১১১]

(১৬). যিক্‌র নং ২৪ : (সকল কল্যাণ লাভের দু'আ: ১ বার)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللّٰهُمّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللّٰهُمّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ। আল্লাহুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফী দীনী ওয়া দুন্‌ইয়াই-য়া, ওয়া আহলী ওয়া মা-লী। আল্লা-হুম্মাস্-তুর 'আউরা-তী ওয়া আ-মিন রাউ'আ-তী। আল্লা-হুম্মা'হ্ ফায্‌নী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমালী, ওয়া মিন ফাউক্বী। ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তা'হ্‌তী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা-নিরাপত্তা দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা-নিরাপত্তা আমার দীনের মধ্যে, আমার দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে, আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ও আমার সম্পদের মধ্যে। হে আল্লাহ, আমার দোষক্রটিগুলি গোপন করুন এবং আমার ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনে থেকে, আমার পিছন থেকে, আমার ডান থেকে, আমার বাম থেকে, আমার উপর থেকে এবং আমি আপনার মহত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমি আমার নিম্ন দিক থেকে আক্রান্ত হব।"

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই সকাল হলে ও সন্ধ্যা হলে উপরের এ কথাগুলি (উপরের দু'আটি) বলতে ছাড়তেন না (সর্বদা তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এই দু'আটি বলতেন)। হাদীসটি সহীহ।[১১২]

এরপর যতক্ষণ সম্ভব উপরে উল্লিখিত ১ নং যিক্‌রটি (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) বেশি বেশি করে যিকর করতে থাকবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের ও সকল মুসলিমের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও বরকত চেয়ে মুনাজাত

---

[১১১] মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৩০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৭, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫।

[১১২] মুসনাদ আহমদ ২/২৫, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৭৩, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৮, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৮১-৩৮৩, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৩।

করবেন। সকল মুসলিম মুর্দা, বিশেষত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আখিরাতের উন্নতি চেয়ে দু'আ করবেন। সম্ভব হলে সূর্যোদয়ের ২৫/৩০ মিনিট পরে যিক্র সমাপ্ত করে দুই বা চার রাকাত 'চাশতের' নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হবেন।

যদি চাশতের নামায পর্যন্ত বসে থাকা অসুবিধা হয়, তবে অন্তত সূর্যোদয় পর্যন্ত অথবা যতক্ষণ সম্ভব যিকরে রত থাকতে চেষ্টা করবেন। পরে সুযোগমত মসজিদে, বাড়িতে বা কর্মস্থলে যেখানে সম্ভব চাশতের নামায আদায় করেবন। আমাদের দেশে সাধারণভাবে সূর্যোদয়ের আধ-ঘন্টা আগে ফজরের জামাত শুরু হয়। এতে জামাতের পরে ২০/২৫ মিনিট যিক্র করলেই সূর্যোদয় হয়ে যায়।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়।" হাদীসটি হাসান।[১১৩]

অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিক্র, তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এ রত থাকা আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের দুজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ সকল যিক্রে রত থাকা আমার কাছে চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়।" এ হাদীসটির সনদও হাসান।[১১৪]

(খ) যোহরের ওযীফা

যোহরে সালাতের পরে উপরে উল্লিখিত ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং যিক্রগুলি পালন করবেন। অর্থাৎ:

(১) তিন বার "আসতাগফিরুল্লাহ'

(২) ১ বার আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু ...

(৩) ১ বার লা- ইলা-হা ইল্লল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, ...

(৪) ১ বার আয়াতুল কুরসী

(৫) ১ বার করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

(৬) ৩৩ বার "সুব'হানাল্লাহ", ৩৩ বার "আল'হামদুলিল্লাহ" এবং ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার"। আর সম্ভব হলে ১০০ বার "সুবহানাল্লাহ", ১০০ বার "আলহামদুলিল্লাহ", ১০০ বার "আল্লাহু আকবার" এবং ১০০ বার "লা- ইলাহা ইল্লল্লাহ"।

---

[১১৩] সুনানু আবী দাউদ ৩/৩২৪, নং ৩৬৬৭, সহীহুত তারগীব ১/২৬০।
[১১৪] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/১৭৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬০।

(গ) আসরের ওযীফা

আসরের সালাতের পরেও যোহরের সালাতের ন্যায় উপরে উল্লিখিত ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং যিক্‌রগুলি পালন করবেন। এরপর সম্ভব হলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, অথবা যতক্ষণ সম্ভব যিকরের এই চারটি বাক্য, অথবা কোনো একটি বাক্য গণনাবিহীনভাবে বেশি বেশি যিকর করতে থাকবেন। উপরের উল্লিখিত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আসরের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ সকল যিকরে রত থাকা অত্যন্ত ফযীলত ও সাওয়াবের কাজ।

(ঘ) মাগরিবের ওযীফা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফজর ও মাগরিবের ওযীফা একই। সালাতুল মাগরিবের পরে উপরে উল্লিখিত ৯নং থেকে ২৪নং যিক্‌রগুলি উপরের পদ্ধতিতে আদায় করবেন। এরপর যতক্ষণ সম্ভব ১ নং (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) যিক্‌রটি পালনে রত থকাবেন।

(ঙ) ইশার ওযীফা

ইশার সালাতের পরেও যোহরের সালাতের ন্যায় উপরে উল্লিখিত ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং যিক্‌রগুলি পালন করবেন। উপরের যিক্‌রগুলি আদায়ের পরে (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্) যিক্‌র করবেন। অন্তত ১০০ বার যিক্‌র করার নিয়মিত অভ্যাস করবেন।

(চ) দরুদের ওযীফা

সালাত বা দরুদ শরীফ মুমিনের অন্যতম যিকির ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় প্রশান্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য হাদীসে তাঁর উপর দরুদ ও সালামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সালাত ও সালামের অতুলনীয় পুরস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন উম্মত তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহ্ তাকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, তার গোনাহ ক্ষমা করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য দোওয়া করেন, তার সালাত ও সালাম তার নাম ও পিতার নামসহ ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাওযা মুবারাকায় পৌঁছে দেন, তিনি তাঁর জন্য দোওয়া করেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যত বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করবে সে কিয়ামতে ততবেশী তাঁর নৈকট্য পাবে। অধিক পরিমাণে সালাত পাঠকারীর সকল সমস্যা আল্লাহ্ মিটিয়ে দিবেন।

মুমিন সর্ববাস্থায় দরুদ-সালাম পাঠ করবেন। হাটতে, চলতে, শুয়ে, বসে, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে যে কোনো সময় সুযোগ পেলে বা খেয়াল হলে ওযু-সহ বা ওযু ছাড়া সর্বাবস্থায় দরুদ পাঠ করতে পারেন। এ ছাড়াও প্রতিদিন এক বা একাধিক সময়ে নির্ধারিত সংখ্যায় দরুদের একটি নির্ধারিত ওযীফা রাখবেন।

ফজর বাদ, আসর বাদ বা অন্য যে কোনো সময়ে দরুদের ওযীফা পালন করা যায়। তবে সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে দরুদের বিশেষ সময় রাত। সম্ভব হলে

তাহাজ্জুদের পরে, না হলে ইশার সালাতের পরে যথাসম্ভব বেশি করে সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন। সম্ভব হলে ৫০০ বার সালাত বা দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। না হলে অন্তত ১০০ বার দরুদ পাঠ করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের, সকল জীবিত, মৃত মুসলমান ও মুরব্বিগণের জন্য দোওয়া করবেন।

(ছ) মুরাকাবা ও মুহাসাবা

মুরাকাবা অর্থ পর্যবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ (supervision/control) এবং মুহাসাবা অর্থ নিরীক্ষা বা হিসাব গ্রহণ (examination/accounting)। তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পরিভাষায় মুরাকাবা অর্থ আত্ম-পর্যবেক্ষণ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং মুহাসাবা অর্থ- আত্ম-নিরীক্ষণ বা নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ।

মুমিনের দায়িত্ব প্রতিনিয়ত নিজের কর্ম ও বিশেষ করে হৃদয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রতিদিন নিজের কর্ম পর্যালোচনা করা। মহান আল্লাহ্ বলেছেন: "হে মুমিনগণ, আল্ল কে ভয় কর, আর প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব যে, আগামীকালের জন্য কী অগ্রীম পা ‌ লা তা অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা।"[১১৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের বিচার করে- হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জন্য কর্ম করে। আর অক্ষম তো সেই ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছামত চলে আর আল্লাহর উপর অবাস্তব কামনা চাপাতে থাকে।"[১১৬]

নিজের মনের অবস্থা ও কর্মের প্রতি নিজের এই পর্যবেক্ষণ সার্বক্ষণিক হওয়া দরকার। বিশেষ করে যখনই একটু অবসর থাকবে তখন অন্য মানুষের বা সমাজের বিষয়ে অলস চিন্তা না করে নিজের কর্মের ও নিজের প্রতি আল্লাহর রহমতের চিন্তা ও পর্যালোচনা করে শুকরিয়া, দু'আ ও ইসতিগফার করা প্রয়োজন। এছাড়াও সম্ভব হলে প্রতিদিন অন্তত ৫/১০ মিনিট নির্ধারিত রাখবেন নিজের বিচার নিজে করার জন্য। তাহাজ্জুদের পরে, নইলে ইশার পরে, নইলে ঘুমানোর পূর্বে অথবা ফজরের পরে এভাবে কিছু সময় গত এক দিনের কর্ম পর্যালোচনা করবেন। এ সময়ে পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব, গত দিনের কর্ম ও হৃদয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে।

যে মানুষের পরবর্তী নিশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই সে কী জন্য হানাহানিতে লিপ্ত হবে? কিজন্য সে লোভ করবে। সেতো পথিক। চলার পথের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করা ও পাথেয় সংগ্রহই তো তার কাজ। চলার পথে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাকে সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিই না কেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তো তাকে আর দেখব-না। রাস্তায়, ফেরীতে, রেলস্টেশনে বা এয়ারপোর্টে বসার চেয়ার, ট্রলি, খাবারের প্লেট, সামান্য ধাক্কাধাক্কির জন্য কি আমরা সময় নষ্ট করে মারামারিতে লিপ্ত হই? এই জীবন তো এ সকল অস্থায়ী স্থানেরই একটু বিস্তৃত রূপ। চেষ্টা করি না কেন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্ষমা, ভালবাসা ও সেবায় ভরে দিতে। তাতে জীবন হবে আল্লাহর রহমতে

---

[১১৫] সূরা হাশর, ১৮ আয়াত।
[১১৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৩৮। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ধন্য আর আমি অর্জন করব আখেরাতের অমূল্য পাথেয়।

পার্থিব স্বার্থপরতা বা লোভের জন্য প্রভুর নির্দেশনার বাইরে কাজ করছি? কি লাভ হবে তাতে? সে লাভ কি ভোগ করতে পারব? পারলে কতদিন। তারপর তো আমাকে প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অমুকের খুশির জন্য, তমুকের কাছে বড় হওয়ার জন্য, আরেকজনের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আমি এই কাজটি করতে চাচ্ছি। কি লাভ তাতে? সে আমাকে কী দেবে? যা দেবে তা থেকে কি আমি লাভবান হতে পারব? আমাকে তো আমার প্রভুর কাছে একাকীই চলে যেতে হবে। আমার তো বাস্তববাদী হওয়া উচিত। নিজের জাগতিক ও পরকালীন জীবনের জন্য যে কাজে আমার মালিক খুশি সেই কাজই তো আমার করা উচিত।

আমি কি গত দিনে কিছু ভাল কাজ করতে পেরেছি? ওযীফাগুলি পালন করতে পেরেছি? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) মহব্বত ও সুন্নাতের অনুসরণে কি অগ্রসর হতে পেরেছি? পারলে আমি অন্তর দিয়ে আমার প্রতিপালকের শুকরিয়া জানাই। আমি অন্যায় ও খারাপ কাজ কি কি করেছি? আমার অন্তরে হিংসা, রাগ, লোভ ইত্যাদি নিষিদ্ধ বিষয়গুলি কি এসেছিল? এগুলির জন্য আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করি। আমি কি কাউকে কষ্ট দিয়েছিলাম? কিভাবে তার ক্ষমা লাভ করব? কেউ কি আমাকে কষ্ট দিয়েছিল? আমি কী করেছিলাম? এখন আমি আল্লাহর কাছে তার ও আমার জন্য ক্ষমা চাইব। এ সময়ে নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা জানিয়ে আল্লাহর তাওফীক চাইতে হবে এবং মনের সকল কষ্ট, ব্যাথ্যা ও চাওয়া-পাওয়া সকাতরে আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে।

(জ) শয়নের ওযীফা

(১). যিক্‌র নং ২৫ : (১০০ তাসবীহ)

৩৩ 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ 'আল-হামদু লিল্লাহ', ৩৪ 'আল্লাহু আকবার':

ফাতেমা (রা) নিজের হাতে যাতা ঘুরিয়ে ও সংসারের সকল কর্ম একা করতে কষ্ট পেতেন। আলী (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তোমার আব্বার নিকট যুদ্ধলব্ধ একটি দাসী চাও, যে তোমাকে সংসার কর্মে সাহায্য করবে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সাথে দেখা করতে এসে তাঁকে না পেয়ে ফিরে যান। রাত্রে তাঁরা বিছানায় শুয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছে আসেন। তিনি বলেন, "আমার আসহাবে সুফফার দরিদ্র সাহাবীগণকে বাদ দিয়ে তোমাকে কোনো দাসী দিতে পারব না। তবে দাসীর চেয়েও উত্তম বিষয় তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যখন বিছানায় শুয়ে পড়বে তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।"[১১৭]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোনো মুসলিম যদি দু'টি কাজ নিয়মিত করতে পারে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ

---

[১১৭] সহীহ বুখারী ৩/১১৩৩, ৩/১৩৫৮, ৫/২০৫১, ৫/২৩২৯, নং ২৯৪৫, ৩৫০২, ৫০৪৬, ৫৯৫৯, সহীহ মুসলিম ৪/২০৯১, নং ২৭২৭, ফাতহুল বারী ১১/১২০।

করবে। কাজ দু'টি খুবই সহজ কিন্তু করার মানুষ খুব কম। **প্রথমত,** প্রত্যেক সালাতের পরে ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এতে ১৫০ বার জিহ্বার যিক্‌র হবে এবং আল্লাহর কাছে আমলনামায় বা মীযানে ১৫০০ সাওয়াব হবে। **দ্বিতীয়ত,** বিছানায় শয়ন করার পরে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এতে মুখে ১০০ বার ও মীযানে ১০০০ বার হবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুলে গুণে গুণে তা দেখান। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : "এই দু'টি কর্ম সহজ হওয়া সত্ত্বেও পালনকারী কম কেন ?" তিনি উত্তরে বলেন : "কেউ শুয়ে পড়লে শয়তান এসে এগুলি বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সালাতের পরে এগুলি বলার আগেই তাকে তার বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে দেয়।" হাদীসটি সহীহ।[১১৮]

(২) যিক্‌র নং ২৬ : আয়াতুল কুরসী

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কেউ রাতে বিছানায় শয়ন করার পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হেফাযত করা হবে এবং কোনো শয়তান তাঁর নিকট আসতে পারবে না।[১১৯]

(৩) যিক্‌র নং ২৭ : সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

আবু মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে তবে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।[১২০]

(৪) যিক্‌র নং ২৮ : সূরা কাফিরূন

নাওফাল আল-আশজায়ী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি সূরা 'কাফিরূন' পড়ে ঘুমাবে, এ শির্‌ক থেকে তোমার বিমুক্তি। হাদীসটি হাসান। এই অর্থে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আরেকটি হাদীস হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১২১]

(৫) যিক্‌র নং ২৯ : সূরা ইখলাস

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবীজী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন: তোমরা কি পারবে না রাতে কুরআনের একতৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে? বিষয়টি তাঁদের কাছে কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে-ই বা তা পারবে? তখন তিনি বলেন: 'কুল হুআল্লাহু আহাদ্' সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।' আবু দারদা (রা) থেকে একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১২২]

(৬) যিক্‌র নং ৩০: সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একত্রে (তিন বার)

দুই হাত একত্র করে এই সূরাগুলি পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে হাত দু'টি

---

[১১৮] সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৬, নং ৫০৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৫৪, সহীহুত তারগীব ১/৩২১-৩২২।

[১১৯] সহীহ বুখারী ২/৮১২, ৩/১১৯৪, ৪/১৯১৪, নং ২১৮৭, ৩১০১, ৪৭২৩।

[১২০] সহীহ বুখারী ৪/১৪৭২, ১৯১৪, ১৯২৩, ১৯২৬, নং ৩৭৮৬, ৪৭২২, ৪৭৫৩, ৪৭৬৪, সহীহ মুসলিম ১/৫৫৪-৫৫৫, নং ৮০৭।

[১২১] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭৪, নং ৩৪০৩, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৩, নং ৫০৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৭০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২১, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ১৩৯।

[১২২] সহীহ বুখারী ৪/১৯১৬, ৪৭২৭, সহীহ মুসলিম ১/৫৫৬, নং ৮১১।

যথাসম্ভব শরীরের সর্বত্র বুলানো। – এভাবে ৩ বার। আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রাতে বিছানায় গমনের পরে তাঁর মুবারক দু'টি হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং তাতে উপরের তিনটি সূরা পাঠ করতেন। এরপর শরীরের যতটুকু সম্ভব স্থান দুই হাত দিয়ে মোছেহ করতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন। – এভাবে ৩ বার করতেন।"[১২৩]

(৭) যিক্‌র নং ৩১: ঋণমুক্তি ও সকল ক্ষতি থেকে রক্ষার দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বাস সামা-ওয়া-তি ওয়ারাব্বাল আরদ্বি ওয়ারাব্বাল **'আরশিল 'আযীম। রাব্বানা- ওয়ারাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফা-লিক্বিল 'হাব্বি ওয়ান নাওয়া-**। ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরক্বা-ন। আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি কুল্লি শাইয়িন আনতা আ-খিযুম বিনা-সিইয়াতিহী। আল্লা-হুম্মা, আনতাল আউআলু, ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন। ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বা-ত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন। ইকদ্বি 'আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনা- মিনাল ফাক্বর।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনের প্রভু এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু, যিনি অঙ্কুরিত করেন শস্য বীজ ও আঁটি, যিনি নাযিল করেছেন তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান; আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার কাছে আপনার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উপরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই গোপন, আপনার নিম্নে আর কিছুই নেই। আপনি আমাদের ঋণমুক্ত করুন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছলতা প্রদান করুন।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিছানায় শয়ন করার

---

[১২৩] সহীহ বুখারী ৪/১৯১৬, নং ৪৭২৯, ৫/২১৬৫, ২১৬৯, ২১৭০।

পরে (ডান কাতে শুয়ে) এই মুনাজাতটি পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে খাদিমা চাইলে তিনি তাঁকে দু'আটি শিখিয়ে দেন।[১২৪]

(৮). যিক্র নং ৩২ : ৩ বার

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ 'আযীম, আল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা- হুআল 'হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : "আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।"

আমরা এই বাক্যটির সাধারণ মর্যাদা ও গুরুত্ব আগেই জেনেছি। সাধারণভাবে সর্বদা এই যিক্রটি পালনীয়। ইমাম তিরমিযী আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার সময় এই কথাগুলি ৩ বার বলবে আল্লাহ তাঁর গোনাহসমূহকে ক্ষমা করবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১২৫]

(৯). যিক্র নং ৩৩ : ঘুমের আগে সর্বশেষ মুনাজাত :

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়াফাওআদ্বতু আমরী ইলাইকা,ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা, লা-মালজাআ ওয়ালা- মানজা- মিনকা ইল্লা- ইলাইকা। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী (ﷺ) প্রেরণ করেছেন তার উপর।"

---

[১২৪] সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৪, নং ২৭১৩।

[১২৫] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭০; আল-আযকার, পৃ. ১৩৯-১৪০, ইমাম গাযালী, এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৩৬৯।

বারা ইবনুল আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবে : (উপরের বাক্যগুলি)। এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে।"[১২৬]

(১০) ওযু অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া

ঘুমের আগে ওযু করে সম্ভব হলে ২/৪ রাক'আত সালাত আদায় করে ঘুমাবেন। বিশেষত যারা শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারবেন না বলে ভয় পাবেন, তারা ঘমানোর আগে ২/৪ রাক'আত 'কিয়ামুল্লাইল' আদায় করে ঘুমাবেন।

ঘুমের জন্য ওযু অবস্থায় শয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এ জন্য বিশেষ দুটি পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "তোমরা তোমাদের দেহগুলিকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ্ তোমাদের পাবিত্র করুন। যদি কোনো বান্দা ওযু অবস্থায় ঘুমান, তবে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকেন। রাত্রে যখনই এই ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এই ফিরিশতা বলেন : হে আল্লাহ্ আপনি এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে ওযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।" হাদীসটি হাসান।[১২৭]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে কোনো মুসলিম যদি ওযু অবস্থায় (আল্লাহর যিক্‌রের উপর) ঘুমায় ; এরপর রাত্রে কোনো সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে (ঐ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে) আল্লাহর কাছে তাঁর জাগতিক বা পারলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে, তবে আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেনই।"[১২৮]

ঘুমানোর সময় রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায়ের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ঘুমাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যদি কেউ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করবে বলে নিয়্যাত করে ঘুমায়, কিন্তু তার ঘুমের আধিক্যের কারণে ভোরের আগে উঠতে না পারে, তবে তাঁর নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব তাঁর জন্য লিখা হবে, আর তাঁর ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।" হাদীসটি সহীহ্।[১২৯]

---

[১২৬] সহীহ বুখারী ১/৯৭, নং ২৪৪, ৫/২৩২৬, নং ৫৯৫২, ৫/২৩২৭, নং ৫৯৫৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮২।

[১২৭] সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৩২৮, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৪৬৬, সহীহুত তারগীব ১/৩১৭।

[১২৮] হাদীসটি সহীহ। নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২০২, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১০, নং ৫০৪২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২২৩, ২২৬-২২৭, সহীহুত তারগীব ১/৩১৭।

[১২৯] সুনানুন নাসাঈ ৩/২৫৮, নং ১৭৮৭, সুনানু ইবনি মাজাহ ১/৪২৬, নং ১৩৪৪, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/১৯৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৫৫, সহীহুত তারগীব ১/৩১৮।

(ঝ) ঘুম ভাঙার ওযীফা

যিক্র নং ৩৪ : রাত্রে ঘুম ভাঙার যিক্র

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর, 'আল-'হামদু লিল্লাহ', ওয়া 'সুব'হা-নাল্লা-হ', ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া 'আল্লা-হু আকবার', লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই। এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর (সাহায্য) ছাড়া।"

উবাদা ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছে'ন, "যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় অতঃপর সে উপরের যিক্রের বাক্যগুলি পাঠ করে এবং এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দু'আ করে বা কিছু চায় তবে তার দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।"[১৩০]

যিক্র নং ৩৫ : ভোরে ঘুম থেকে উঠার যিক্র:

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ : আল-'হামদু লিল্লা-হিল লাযী আ'হইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে, আর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ও আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুম থেকে উঠে উপরের যিক্রটি বলতেন।[১৩১]

---

[১৩০] সহীহ বুখারী, ১/৩৮৭, নং ১১০৩।
[১৩১] সহীহ বুখারী ৫/২৩৬, ২৩২৭, ২৩৩০, ৬/২৬৯২, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৩, নং ২৭১১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ যিকিরের মাজলিস

(ক) মাজলিসে যিকরের গুরুত্ব

'মাজলিস' শব্দের অর্থ বৈঠক বা বসা। সাধারণভাবে 'মাজলিস' বলতে অল্প বা বেশি সময়ের জন্য একাধিক ব্যক্তির একত্রে বসাকে বুঝানো হয়। মাজলিস, বৈঠক বা মিটিং-এর ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব তিন প্রকারঃ

প্রথমত, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির বৈঠক বা মাজলিস সতর্কতার সাথে পরিহার করা। চায়ের দোকানে, বাজারে বা কোথাও এরূপ অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব হলে নিজের মনে আল্লাহর যিক্‌র করুন অথবা উঠে চলে যান।

দ্বিতীয়ত, কোথাও কোনোভাবে কয়েকজন একত্রে বসে কথাবার্তায় লিপ্ত হলে কথাবার্তার ফাঁকে মাঝে মাঝে আল্লাহর যিক্‌র ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "যদি কয়েকজন মানুষ কোথাও একত্রে বসে কিন্তু সেই বৈঠকে তারা আল্লাহর যিক্‌র না করে তবে তা তাদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ সামান্য পরিমাণও হাঁটে এবং সেই হাঁটার মধ্যে সে আল্লাহর যিক্‌র না করে, তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ বিছানায় শোয় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র না করে তবে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১৩২]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ "যখন কিছু মানুষ একটি মাজলিসে বসে, কিন্তু সেই মাজলিসে তারা আল্লাহর স্মরণ করে না এবং তাদের নবীর (ﷺ) উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করে না তবে এই মজলিসটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন।" অন্য বর্ণনায়ঃ "তারা জান্নাতে গেলেও উক্ত মাজলিস তাদের দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে, কারণ যে সাওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হবেন তার জন্য তারা দুঃখ ও আফসোস করবেন।"[১৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশি কথা বলবে না; কারণ আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশি কথা হৃদয়কে কঠিক করে তোলে। আর আল্লাহর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মানুষ কঠিন হৃদয়ের মানুষ।"[১৩৪]

তৃতীয়ত, নিয়মিত যিকরের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া।

---

[১৩২] সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৩৩, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১৭-৩২২, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১০৭, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ১/৪০৩, নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি, পৃ. ৩১২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮০।

[১৩৩] তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত ৫/৪৬১, নং ৩৩৮০। ইমাম তিরমিযী বলেছেন : "হাদীসটি হাসান সহীহ"। মুসনাদে আহমদ ২/৪৫৩, নং ৯৫৩৩, ৯৮৮৪।

[১৩৪] সুনানুত তিরমিযী ৪/৬০৭, নং ২৪১১। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

(খ) যিকরের মাজলিসের পরিচয়

'যিকিরের মাজলিস' হলো ঐ মাজলিস যেখানে কয়েকজন মুমিন একত্রিত হয়ে আল্লাহর গুণাবলি, নেয়ামত, বরকত, তাঁর রাসূল (ﷺ), তাঁর দীন, তাঁর বিধান, পুরস্কার, তাঁর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ইত্যাদির আলোচনা করেন। আল্লাহর প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, পবিত্রতা ও একত্ব উল্লেখ করেন। তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এক মাজলিসে সকল প্রকারের যিকির একত্রিত হতে পারে বা কিছু কিছু যিকিরও হতে পারে। এরূপ মাজলিসের ফযীলত ও সাওয়াবের বিষয়ে অনেক সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে অল্প কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণ (যিক্‌র) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিক্‌র) করেন তাঁর (আল্লাহর) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে।"[১৩৫]

আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাঁদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে। তাঁরা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর থাকবে। সকল মানুষ যাঁদের নিয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এই নিয়ামত কামনা করবে। তাঁরা নবী নন বা শহীদও নন।" তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বলেন : "তাঁরা ঐসব মানুষ যাঁরা একে অপরকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে এসে তাঁরা আল্লাহর যিক্‌রের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিক্‌র করে।" হাদীসটি হাসান।[১৩৬]

আমর ইবনু আনবাসাহ (রা) থেকে বর্ণিত এই অর্থের অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসকল মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "এরা হলেন বিভিন্ন গোত্র, দেশ বা এলাকা থেকে আগত মানুষ, যাঁরা আল্লাহর যিক্‌রের জন্য সমবেত হন এবং সুন্দর ও পবিত্র বাক্যসমূহ চয়ন করেন, যেমনভাবে খেজুর ভক্ষণকারী ভালো ভালো খেজুর বেছে নেয়।"[১৩৭]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যিক্‌রের মাজলিসের গনীমত (লাভ) কী ? তিনি বলেন : "যিক্‌রের মাজলিসসমূহের গনীমত বা লাভ জান্নাত।" হাদীসটির সনদ হাসান।[১৩৮]

---

[১৩৫] সহীহ্ মুসলিম ৪/২০৭৪, নং ২৭০০।
[১৩৬] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭, আত-তারগীব ২/৩৮৩।
[১৩৭] আত-তারগীব ২/৩৮৮-৩৮৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭। সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।
[১৩৮] মুসনাদ আহমদ ২/১৭৭, ১৯০, আত-তারগীব ২/৩৮১, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮।

প্রখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী (৫০-১৩৫ হি) বলেনঃ "যিক্রের মাজলিস হালাল হারাম আলোচনার মাজলিস। কিভাবে বেচাকেনা করবে, কিভাবে ব্যবসা করবে, কিভাবে সালাত আদায় করবে, কিভাবে সিয়াম পালন করবে, কিভাবে বিবাহ করবে, কিভাবে তালাক দিবে, কিভাবে হজ্ব পালন করবে এবং অনুরূপ সকল বিষয় আলোচনার মাজলিসই যিক্রের মাজলিস।"[১৩৯]

(গ) যিকিরের মাজলিসের যিকির

হাদীস থেকে আমরা জানাতে পারি যে, যিকিরের মাজলিস মূলত ঈমান ও ইল্ম বৃদ্ধির মাজলিস। এই মাজলিসের মূল হলো আলোচনা ও ওয়ায। আমরা সাধারণত মনে করি যে, যিকিরের মাজলিস অর্থ একাকী পালনীয় যিকির আযকারগুলি একত্রে পালন করার মাজলিস। ধারণাটি ভুল ও সুন্নাতের খেলাফ।

যিকির মূলত দুই প্রকার – **প্রথমত**, স্মরণ করা এবং **দ্বিতীয়ত**, স্মরণ করানো। যিকিরের মাজলিসের অন্যতম প্রধান যিকির হলো স্মরণ করানো বা ওয়ায আলোচনা। আমাদের বুঝতে হবে যে, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিকির মুমিন একাকী পালন করতে পারেন। কিন্তু ইল্ম, তাকওয়া ও আল্লাহর পথে চলার আগ্রহ বৃদ্ধিমূলক আলোচনা একা করা যায় না বা করতে অসুবিধা। যিকিরের মাজলিসে এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এসকল আলোচনা, দোয়া ইত্যাদির মধ্যে আলোচনার আবেগ ও প্রেরণা অনুসারে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, সালাত, সালাম ইত্যাদি মাসনূন যিকির মাসনূন পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে।

হাদীস শরীফে বিশেষভাবে যিকিরের মাজলিসে নিম্নের যিকিরগুলি পালনের কথা বলা হয়েছে : ১) কুরআন তিলওয়াত ও আলোচনা, ২) ঈমান ও তাকওয়া উদ্দীপক ওয়ায ও আলোচনা, ৩) আল্লাহর নিয়ামতের আলোচনা করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ৪) তাসবীহ বা 'সুব'হানাল্লাহ' বলা, ৫) তাকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলা, ৬) তাহলীল বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, ৭) তাহমীদ বা 'আল হামদু লিল্লাহ' বলা, ৮) সালাত বা দরুদ পাঠ করা, ৯) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করে দোয়া করা, ১০) জান্নাত প্রার্থনা করা, ১০) জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, ১১) ইস্তিগফার করা বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আন্তরিকতা ও আবেগের সাথে কাঁদাকাটি করা।

(ঘ) দরবারে ফুরফুরার তালিমী মাহফিল

মাসনূন পদ্ধতিতে যিক্র ও যিকরের মাজলিস কায়েম করার জন্য ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবুল আনসার সিদ্দীকী (রাহ) জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ' সংগঠনের আওতায় সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক 'তালিমী' মাহফিলের ব্যবস্থা করেন। সর্বশেষ গত ১৩/০৭/০৫ তারিখে দারুস সালাম 'জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ'-র মুবাল্লিগ সম্মেলনে মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে লিখিত নসীহতে তিনি এ

---

[১৩৯] আবু নুআইম, হিলউয়াতুল আউলিয়া ৫/১৯৫, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ৩০, যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১৪২।

বিষয়ক মূলনীতি ও তালীমী নেসাব ঘোষণা করেন। উক্ত লিখিত নসীহতে তিনি বলেনঃ "প্রিয় মুবাল্লিগ ভায়েরা, আস-সালামু আলাইকুম। ফুরফুরার একজন মুবাল্লিগ হিসেবে মনোনীত হওয়ায় আপনাকে মোবারকবাদ। ফুরফুরা নতুন কোনো কথাও শিখাচ্ছে না, নতুন কোনো কাজও আপনাকে দিচ্ছে না। কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়েছে পরস্পরকে সত্যের তাকীদ ও উপদেশ দিতে। ... রাসূলগণের দায়িত্বই ছিল 'বালাগুল মুবীন' বা সুস্পষ্ট প্রচার।... বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সুতরাং আপনারা সেই মূল হুকুম অনুসারে মুবাল্লিগ হচ্ছেন।

ফুরফুরার পীর সাহেবের বা কোনো বুজুর্গের কারামত বর্ণনা, তাবিজ দেওয়া, ঝাড়ফুঁক করা, খেলাফত লাভ করে পীর হয়ে বসা এগুলো আপনাদের দায়িত্ব নয়। আপনার আকীদা সঠিক হলে, আমল সুন্নাত মোতাবেক হলে, আপনি বেলায়াতের যোগ্য হলে, আপনি ওলী হয়ে যাবেন, সেটা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সুতরাং আপনারা নিজেরা কুরআন পড়ে ও প্রয়োজনে বাংলা অনুবাদ পড়ে বুঝবেন, হাদীসে রাসূল (ﷺ)-এর অনুবাদ পড়ে বুঝবেন, নিজেরা আমল করবেন এবং সেই অনুযায়ী নসীহত করবেন। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা কেনো তা বলো যা তোমরা করো না? আল্লহর কাছে খুবই নিন্দনীয় যে, তোমরা যা বলো তা করো না।" (সূরা আস-সাফ্ফঃ ২-৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেরাজে গিয়ে দেখেছেন, আগুনের কাঁচি দিয়ে তাদেরই ঠোঁট কাটা হচ্ছে যারা নসীহত করতো কিন্তু নিজেরা আমল করতো না। আপনাদের কাজ সহজ হবে যদি আপনারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জাত ও সেফাত সম্পর্কে আলোচনা করেন, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেজন্য বিদআতের পরিচয় ভালোভাবে জানা দরকার। আমাদের প্রকাশিত কিতাব 'এহইয়াউস সুনান' এ বিষয়ে সুলিখিত ও গবেষণামূলক। মাওলানা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এই কিতাবের লেখক হিসেবে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। তাঁর আরো কিতাব আছে, যেমন 'রাহে বেলায়াত', 'ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)', 'আল্লাহর পথে দাওয়াত', 'ইসলামে পর্দা' ইত্যাদি। কিতাবগুলো সংগ্রহ করে পড়বেন। ... আপনাদের জন্য 'কুরআন-সুন্নাহর কষ্টি পাথরে ফুরফুরার মত' নামে পত্রিকা ছেপেছি। এতে একটা লেখা আছে, 'আমি ওষুধ খেলে আপনি সুস্থ হবেন কি?' এই শিরোনামে। সেটা পড়লে আমার কাজের ধারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।.....

আমি বলে থাকি, "আমার নিজস্ব কোনো মত নেই, কুরআন ও সুন্নাহ যা বলে সেটাই আমার মত।" এ কারণেই পূর্বেও জায়েয জানতান, এখনো জায়েয জানি, কিন্তু সুন্নাত সম্মত নয় বলে আমি কিয়াম করা পছন্দ করি না। ... আমার পিতা ফুরফুরার পীর বড় হুজুর আব্দুল হাই (রাহ)-কে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাছে থেকে দেখেছি এবং আমার মতো তাঁকে বুঝবার এবং তাঁর কাছে থেকে তালিম-তাওয়াজ্জুহ নেবার সুযোগ কে পেয়েছে? আবার তিনি মোজাদ্দেদে জামান আবূ বকর সিদ্দিকী (রাহ)-এর কাছে যা কিছু শিখেছেন আমাকে তা শিখিয়ে গেছেন। তাঁরা উভয়েই বড়

বড় কাজ করেছেন। সমাজের বহু শিরক বিদআতকে তাড়াতে গিয়ে জায়েয কিছু বিদ'আতকে তাঁরা গুরুত্বহীনভাবে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

মাওলানা রুহুল আমীন (রাহ) তাঁর লেখা মোজাদ্দেদে জামান (রাহ)-এর বিস্তারিত জীবনী গ্রন্থে তাঁর ওসিয়তনামা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ... যেমন "ফুরফুরার খলিফা ও মুরিদের কেহ কুরআন, হাদীস ও ফেকেহসমূহের বিপরীত চললে কেহ যেন না মানেন। (১০ নং ওসীয়ত)। .... এলমে-গায়েব আল্লাহ তায়ালা হযরত নবী (ﷺ)-কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ তায়ালা, এইরূপ আকীদা রখিবেন। হযরত (ﷺ) যে গায়েব জানেন, সেই গায়েবকে এলমে-হুসূলি বলে। (৩৫ নং ওসীয়ত) .... আমার খলীফা ও মুরীদগণের মধ্যে হাজার হজার আলেম আছেন, যারা বহু কিতাব লিখেছেন, ওই সব কিতাবের শরীয়তের খেলাফ কথা কেউ মানবেন না... (৪২ নয় ওসিয়ত)। সুতরাং আমরা, অর্থাৎ আমার পূর্ববর্তী ফুরফুরার দুইজন পীর এবং আমি এক নীতিতে আছি।

একজন মুবাল্লিগ নিজে সংশোধন হবেন কেবল তাই নয়, তাঁর দ্বারা সমাজও হেদায়েতের দিশা পাবে। সুতরাং ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যাদের উদ্দেশ্যে নসীহত করা হচ্ছে তাদের প্রতি সম্মান ও দরদ উভয়টিই জরুরী। যে কোনো মুসলমানের ধন ও সম্মান অন্য মুসলানেরর কাছে নিরাপদ আমানতের তুল্য। কেবল ফুরফুরার পীরই হক ছিলেন এমন জাহালতি ধারণা করবেন না। ..... যে কোনো মাযহাব পন্থী, এমনকি লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস, তাবলীগ জামাত, জামায়াতে ইসলামী, দেওবন্দী এরা সকলেই যার যার সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাউকে মন্দ জানবেন না এবং পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টির কোনো কাজ করবেন না। সকল মুসলমান মিলেই সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু কুরআনকে মজবুতভাবে ধরে রাখতে এবং পরস্পরে বিভেদ না করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন। (সূরা আল-ইমরানঃ ১০৩)

ফুরফুরার জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ্ সংগঠনের জন্য তালিমী নিসাবঃ

তালিমী মাহফিলকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করবেন। প্রথম পর্যায়ে যিকরের তালিম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য আমলের তালিম। প্রথম পর্যায়ে কমবেশি আধাঘন্টা যিকরের তালিম দিবেন। সকল প্রকার যিকর-তালিম যথাসম্ভব মৃদু শব্দে, বিনয় ও ভয়ের সথে পালন করবেন। প্রত্যেকে মৃদু শব্দে যিকরের সময় বিনয় ও ভয় সহকারে নিজের মধ্যে হালত সৃষ্টির চেষ্টা করবেন।

প্রথম পর্যায়ঃ

(১) সালাতুল মাগরিবের পরে সকলেই দুই রাক'আত করে ৬ রাকআত নফল সালাত (সালাতুল আওয়াবীন নামে পরিচিত) আদায় করবেন।

(২) এরপর একবার সাইয়্যেল ইসতিগফার (এই বইয়ের পূর্ববর্তী ১৬ নং যিকর) এবং তিন বার 'আসতাগফিরুল্লাহাল আযীম আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি (পূর্ববর্তী ৭ নং যিক্‌র) পাঠ করবেন। তালিম পরিচালনাকারী এগুলির অর্থ আলোচনা করে সকলের মনের মধ্যে

তাওবার হালত পয়দার চেষ্টা করবেন। এরপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণভাবে ইসতিগফার করবেন।

(৩) ৩ বার সূরা ফাতিহা, ১০ বার সূরা ইখলাস ও ১১ বার দরুদ শরীফ (দরুদে ইবরাহীমী) পাঠ করে মুনাজাত করবেন।

(৪) আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার (৭ বার) পাঠ করবেন (পূর্ববর্তী ১১ নং যিক্‌র)

(৫) এরপর তালিম দানকারী বা মুবাল্লিগ আদবের সাথে নিম্নের যিক্‌রুগলি অনেকবার পাঠ করবেন। উপস্থিত প্রত্যেকে আদবের সাথে মৃদু শব্দে পাঠ করবেন। তালিমদানকারী ব্যক্তি যিকরের অর্থের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করে সকলের মনের মধ্যে হালত তৈরির চেষ্টা করবন:

(ক) সুবহানাল্লাহ (পূর্ববর্তী ২ নং যিক্‌র)

(খ) আল-হামদু লিল্লাহ (পূর্ববর্তী ৩ নং যিক্‌র)

(গ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (পূর্ববর্তী ১ নং যিক্‌র)

(ঘ) আল্লাহু আকবার (পূর্ববর্তী ৪ নং যিক্‌র)

(ঙ) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ:সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী সুব'হা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

অর্থ: "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

(চ) লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (পূর্ববর্তী ৫ নং যিক্‌র)

(৬) এরপর যতক্ষণ সম্ভব বেশি করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যিকর করবেন।

(৭) এরপর তাওবার সবক পালন করবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়:

কমবেশি আধাঘন্টা থেকে এক ঘন্টা ইলম-আমলের তালিম দিবেন। প্রথম পর্যায়ের শেষে মুবাল্লিগ, তালিমদানকারী ব্যক্তি বা অন্য কেউ নিম্নের কিতাবগুলি থেকে নিয়মিত পাঠ করবেন। সময় ও সুযোগ মত অল্প বা বেশি করতে পারেন। এ সকল বইয়ের বাইরে কোনো ওয়ায বা গল্পে সময় নষ্ট করবেন না।

(ক) মাআরেফুল কুরআন থেকে অনুবাদ পাঠ (কমবেশি ১০ মি)

(খ) রিয়াদুস সালিহীন থেকে বাংলা অনুবাদ হাদীস পাঠ (কমবেশি ১০ মি)

(গ) এহইয়াউস সুনান থেকে নিয়মিত পাঠ (কম বেশি ১০ মি)

(ঘ) ইবাদাতুল মু'মিনীনের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে নিয়মিত পাঠ (কমবেশি ১০ মি)

মাহফিল শেষে মুবাল্লিগ বা মাহফিল পরিচালনাকারী ব্যক্তি সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে দৈনন্দিন সবক পূর্ণ করার উৎসাহ প্রদান করবেন। শেষে মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল শেষ করবেন।

وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে :

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. ইসলামে পর্দা
৩. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৪. রাহে বেলায়াত: রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র-ওযীফা
৫. মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত : গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৭. হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৮. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত
৯. মুনাজাত ও নামায
১০. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
১১. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ: আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা

উপরের গ্রন্থগুলি বা লেখকের লেখা অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে বা সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন ঃ

১. মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি.বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়), ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫২৯৫৪।
২. আলহাজ্ব মাওলানা মো. ইদ্রিস আলী, মুহতামিম, জামিয়াতুল কুরআনিল কারীম, দারুশ শারীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী ঈশ্বরদী, পাবনা। মোবাইল ঃ ০১৭১৭-১৫৩৯২৩।
৩. মাওলানা আ.স.ম. শোয়াইব আহমদ, পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-৭০০৩। ফোন ঃ ৬২২০১-এক্স. ঃ ২৪৩১; মোবাইল ঃ ০১৯১৩৯১৮৩২৮।
৪. মো. আনোয়ার হোসেন, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ফোন ঃ ০২-৯০০৯৭৩৮।